কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ

পরিষদের চেষ্টায় আবার একখানি অশ্রুতপূর্ব্ব পুথির বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে।

এই আলোচ্য পুথিখানির নাম "মহারাষ্ট্র-পুরাণ।" পুথির রচয়িতার নাম কবি গঙ্গারাম। পুরাণখানি কত বড়, কয় খণ্ডে বিভক্ত, তাহা কিছুই জানা যায় না। আমরা যে অংশটুকু পাইয়াছি, তাহা প্রথম-কাণ্ড মাত্র। এই কাণ্ডের নাম 'ভাস্কর-পরাভব'। পুথি-খানির তারিখ শকাব্দা ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ পৌষ রোজ শনিবার। বাঙ্গলা ১১৬৪ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়; সুতরাং পুথিখানি পলাশীর যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্ব্বে লেখা। লেখকের নাম নাই। ১৩১১ সালে ময়মনসিংহে যে শিল্পকৃষি-সাহিত্য প্রদর্শনী হইয়াছিল, "ময়মনসিংহের ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সেই প্রদর্শনীতে এই পুথিখানি উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি কোথায় কিরূপে এই পুথিখানি পাইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থখানি "মহারাষ্ট্র-পুরাণ", অতএব পুরাণের ন্যায় ইহার মুখবন্ধ অতি গুরু গম্ভীরভাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ লিখিতে গিয়া মহর্ষি বেদব্যাস যে কৌশলে পুরাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রপুরাণ-কর্ত্তা কবি গঙ্গারাম সেই মহাজন-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিবেন কেন?—তিনি গ্রন্থারম্ভেই লিখিতেছেন,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

"রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা। রাত্রদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শৃঙ্গার কৌতুকে জীব থাকে সর্ব্বক্ষণ। হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে। এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥
এত যদি পাপ হইল পৃথিবী উপরে। পাপের কারণে পৃথি ভার সহিতে নারে॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর। কহিতে লাগিলে পৃথি ব্রহ্মা বরাবর॥
পাপের কারণে প্রভু পৃথি হইল ভারি। কত ব্যাম পাব আমি ভার সহিতে নারি॥
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা বোলিছে বচন। ব্যাকুল না হইয়া তুমি ধৈর্য্য কর মন॥
পৃথি সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেল শিবস্থানে। কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে॥
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি নারায়ণ। স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন॥
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি বন্ধুজন। এ মহীমণ্ডল প্রভু তোমার সৃজন॥
এতেক বিনয় যদি কৈলা ব্রহ্মাবর। হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা শঙ্কর॥
এতেক মিনতি কর কিসের কারণ। বোল দেখি সু(শু)নি আমি তাহার বিবরণ॥

তবে ব্রহ্মা কহিলেন হাসি ত্রিলোচনে। পৃথিভার সহিতে নারে পাপের কারণে ॥
পাপমতি হইল জীব করে দুরাচার। পাপিষ্ঠ মারিআ প্রভু দূর কর তার ॥
কহিতে লাগিলা হর এতেক সুনিঞা। পাপিষ্ঠ মারিছি আমি দুত পাঠাইঞা ॥
এতেক বলিলা যদি ব্রহ্মার গোচর। পৃথি সঙ্গে গেলা ব্রহ্মা আপন ঘর ॥
তবে ব্রহ্মা বিদায় করিলা পৃথিরে। ভাবিতে ভাবিতে পৃথি আইলা আপন ঘরে ॥

ইহার পরে মহাদেব একটু ভাবনায় পড়িলেন। ব্রহ্মা ও পৃথিবীকে তিনি অভয় দিলেন; কিন্তু কিরূপে কাজটা সমাধা করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে বসিলেন।

'ব্রহ্মাকে বিদায় দিয়া শিব রহিলা ধ্যানে।
কতক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে ॥'

ধ্যানে ভাবিয়া চিন্তিয়া কথাটা শিবের মনে উদিত হইল,—পৃথিবীর ভারনাশের প্রণালীটা স্থির হইয়া গেল। তখন,—

'নন্দীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন। দক্ষিণ সহরে তুমি জাহ ততক্ষণ ॥
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে। অধিষ্ঠান হও জাইয়া তাহার কণ্ঠেতে ॥
বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে। দুত পাঠাইঞা জেন পাপিলোক মারে ॥
এতেক সুনিঞা নন্দী গেলা শীঘ্রগতি। উপনীত হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি ॥'
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে। অনেকদিন হইল বাঙ্গালার চৌত না দেহ মোরে॥

এইস্থান হইতে আমাদের আলোচ্য মহারাষ্ট্র-পুরাণের ঐতিহাসিক অংশ আরম্ভ হইল; কিন্তু গোড়ায় গলদ! কবির কথায় বলিতে গেলে "দক্ষিণ সহর" নতুবা আসলে সেটি কোন দেশ তাহা ভূতভাবন ভবানীপতি ভাবিয়া চিন্তিয়াও বলিয়া দিলেন না। আসল কথা, কবি গঙ্গারামের বাড়ী রাঢ়ের যে গ্রামেই থাকুক না, তিনি যে বাঙ্গালার বাহিরে চতুর্দ্দিকে কোথায় কোন দেশ আছে, আর তাহার নাম কি, তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না, তাহা তাঁহার শিবের কথায় বুঝা যাইতেছে। যাহা হউক কবির দক্ষিণ সহরের রাজা সাহুরাজা যে কে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই; কারণ ভাস্করপণ্ডিত যখন আসেন, তখন মহারাষ্ট্রে বালাজী রাও পেশওয়া রাজত্ব করিতেন। যাহা হউক শিব নন্দীকে দক্ষিণ সহরে যাইতে বলিলেন বটে; কিন্তু সাহুরাজার অবস্থিতি স্থানটা বেশ সুনির্দ্দেশ করিয়াই বলিয়া দিলেন না, "সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।" যাহা হউক নন্দী বেচারী শীঘ্রগতি পৃথিবীটা খুঁজিয়া "উপনীত হইল গিয়া সাহুরাজা প্রতি।" কবি গঙ্গারামের দক্ষিণ দেশের জ্ঞান বা মহারাষ্ট্র দেশের জ্ঞান যতই অস্পষ্ট হউক না, ঐতিহাসিক ঘটনায় তাঁহার অতঃপর আর ভুল নাই। সাহুরাজার ঘাড়ে নন্দী ভর করিলে, সাহুরাজা রঘুরাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুদিন বাঙ্গালার চৌথ পাই নাই কেন? এই রঘুরাজা যে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, আর তখন মহারাষ্ট্র-রাজ যে বাঙ্গলার রাজস্বের এক চতুর্থাংশ পাইতেন তাহাও জানেন।

আলীবর্দ্দী খাঁ বিদ্রোহী হইয়া যখন সরফরাজ খাঁর হাত হইতে বাঙ্গালার মসনদ কাড়িয়া

লন, সেই গোলোযোগে বাঙ্গালার রাজস্ব দুই বৎসর দিল্লীতে যায় নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৭৪০ সালে দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্‌র নিকট বাঙ্গালার চৌথ দাবী করিয়া পাঠান। বাদশাহ্ সত্য কথা বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বাঙ্গালায় আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতে আদেশ দেন।

নন্দী ভর করিবামাত্র সাহুরাজা রঘুরাজাকে বলিলেন, বাদশার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া দাও, জানিয়া আসুক—বাঙ্গালার চৌথ কেন পাওয়া যাইতেছে না। 'রঘুরাজা পত্র লিখে আখর পাঁচ সাতে' অর্থাৎ সংক্ষেপে পত্র লেখা হইল। দিল্লীপতি যথাকালে পত্র পাইলেন ও তাহার মর্ম্মার্থ অবগত হইলেন। এই দিল্লীপতিটি কে, কবি গঙ্গারাম তাহা আমাদের বলিয়া দিলেন না। কিন্তু তিনি যে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। তাহার পর দিল্লীপতি একটু কৌশল করিয়া জবাব দিলেন,—

"চাকর হইয়া মারিল সুবারে। জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥
লোক লস্কর তবে নাই আমার স্থানে। হেন কোন নাই তারে গিয়া আনে ॥
বাঙ্গালা মুল্লুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে। দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেয় মোকে ॥
জবর হইয়া সেই আছে বাঙ্গালাতে। চৌথের কারণে লোক পাঠাও তথাতে ॥"

দিল্লীপতি এই পত্র লিখিয়া কৌশলে ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে; কিন্তু আপনার অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, হীনতা শত্রুর নিকট ষোল আনা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন—কবি গঙ্গারাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহুরাজাও একটু বোকা-ধাতুর লোক বলিতে পারা যায়। এরূপ একটা চিঠি পাইয়া সাহুরাজার বাঙ্গালার সামান্য চৌথ আদায়ে যাত্রা করা অপেক্ষা দিল্লীর ষোল আনাই আদায় করিতে গেলে বোধ হয় ক্ষতি হইত না। যাক্ সাহুরাজা বুদ্ধিমান হইবার আশায় তাহা করেন নাই, ইতিহাস বজায় রাখিবার জন্য তিনি বাঙ্গালাতে চৌথ আনিতেই গেলেন; অর্থাৎ বাদ্‌শার পত্র পাইয়া কাহাকেও চৌথ আদায়ের জন্য বাঙ্গালায় যাইতে বলিলেন। রঘুরাজা নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি নিজে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, 'তথাস্তু' তাহাই পাইলেন—কিন্তু রঘুরাজা নিজে না গিয়া দেওয়ান ভাস্করকে পাঠাইলেন। ভাস্কর ডঙ্কা নাগারা নিশান ও ফৌজ লইয়া চলিলেন। সেতারা ছাড়িয়া বিজাপুর হইয়া তিনি রওয়ানা হইলেন, বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালার নবাবী চাল দেখিয়াছেন, নবাবী সেনার কুচ কাওয়াজের প্রথাই তিনি জানেন, কাজেই তিনি মহারাষ্ট্রীয় কঠোরতার বিষয় না জানিয়াই পথের বিবরণে বিজাপুরে ভাস্করসৈন্যের একরাত্রি বিশ্রাম বর্ণনার মধ্যে স্বচ্ছন্দে লিখিয়া দিলেন,—

'সেতারা ছাড়িয়া যবে, বিজাপুর আইলা তবে,
একরাত্রি রহিলা সেই খানে।
রাগরঙ্গ হইল যত, নাটুয়া নাচিল কত,
কটক চলিল পর দিনে ॥'

যাহা হউক, ভাস্কর ক্রমে গ্রাম উপবন ছাড়াইয়া নাগপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার জানা আবশ্যক হইল, নবাব কোন স্থানে আছেন। চর প্রেরিত হইল। শীঘ্র চরমুখে সংবাদ আসিল। বর্দ্ধমান সহরে রাণীর দীঘীর পাড়ে নবাব ছাউনি করিয়া আছেন। তখন আবার কুচ আরম্ভ হইল। বীরভূম বামে রাখিয়া গোয়াল-ভূমের পার্শ্ব দিয়া ভাস্কর স্বদলে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে ভাস্কর নবাবকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, নবাব নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, এ সকল কিছুই জানিলেন না। হরকরা অর্থাৎ প্রহরীরা রাত্রিতেই এই বিপদের কথা জানিতে পারিল এবং রাজারামকে সংবাদ দিল। এই নবাবটির নাম কি, কবি গঙ্গারাম তাহাও আমাদের কোথাও বলিলেন না। রাজারাম লোকটা যে কে, তাহারও কোন পরিচয় তিনি দেন নাই, তবে একটা তারিখ তিনি আমাদের এই সময় বলিয়া দিয়াছেন—

'বৈশাখের উনিশায়, বরগী আইলা তায়,
মহা আনন্দিত হইয়া মনে।'

১৯শে বৈশাখ বরগী বর্দ্ধমান ঘিরিল ; কিন্তু কোন্ বৎসর তাহা কবি গঙ্গারামের মনেই রহিয়া গেল, কলমে ফুটিল না। পরদিন প্রাতে রাজারাম সংবাদদাতা হরকরাকে সঙ্গে লইয়া নিজের সতর্কতার কথা জানাইয়া অম্লানবদনে নবাবকে বলিলেন ;—

'ইহা আমি না জানিল, আচম্বিতে সৈন্য আইল,
আসিয়া ঘেরিল লস্করে।'

নবাবটী এ সংবাদে রুষ্ট কি তুষ্ট হইলেন, রাজারামকে কর্ত্তব্য পালনের জন্য অথবা তাহার সরল সত্য কথার জন্য কোন আদর আপ্যায়ন করিলেন কি না, কবি তাহা কিছুই লেখেন নাই ; কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে নবাবটিকে একটু বুদ্ধিমান্, কর্ম্মতৎপর লোক বলিয়া বুঝা যায়। কবি লিখিয়াছেন—

'রাজারামে এত কয়, নবাব শুনিয়া রয়,
তৎপরে দিলেন উত্তর।
হরকরা পাঠাইয়া, হকিকত আনাইয়া,
কোথা হইতে আইল লস্কর॥'

গতানুশোচনা ত্যাগ করিয়া নবাব উপস্থিত মত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চর গিয়া সংবাদ আনিল,—

'চব্বিশ জমাদার, ভাস্কর সরদার,
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইঞা।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে,
সাহুরাজার হুকুম পাইঞা॥'

নবাব শুনিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে মুস্তাফা খাঁ বলিলেন, একি কথা, যখন সুজা খাঁ

নবাব ছিলেন, তখন বাঙ্গালার বাদশাহী খাজনা দিল্লী যাইত, সেখান হইতে মাহারাট্টা চোথাই পাইত, এখান হইতে কখন দেওয়া হয় নাই।

তাহার পর নবাব উকীল পাঠাইয়া ভাস্করকে দিল্লী হইতে চৌথ নিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভাস্কর বলিলেন, দিল্লীর বাদশাহ্‌র হুকুমে যখন আসিয়াছি, তখন রাজ্য নষ্ট করিয়াও চৌথ লইয়া যাইব। নবাব আশায় পড়িয়া চৌথ দিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—

'এতেক শুনিয়া যবে, নবাব জানিল তবে,
ডাক দিয়া জমাদারে কহে।
যত জমাদার ছিল, তারে নবাব কহিল,
চৌথাই চাহে বারে বারে ॥'

জমাদার অর্থাৎ সেনাপতিরা নবাবের মনোভাব বুঝিয়া বলিল,—

"[illegible] বর[illegible]হ সিপাএরে।
আমরা যত লোকে, মারিব বরগিকে,
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে ॥"

সৈন্যগণের বেতন পাওনা ছিল, তাহারা দেখিল টাকাটা কেন বাহিরে যায়, নবাবও কথাটা গ্রাহ্য করিলেন, কারণ দিল্লীপতির ন্যায় তাঁহার আর তখন "হেন কোন জন নাই তারে গিয়া আনে" বলিয়া নাকে কাঁদিবার অবসর রহিল না। নবাব তার পর, "পানবাটা কাছে ছিল, পান তুইলা সভারে দিল।"—যুদ্ধের উদ্যোগ পড়িয়া গেল।

এদিকে ভাস্কর পণ্ডিতও সাজিতে লাগিলেন। যে সকল সর্দ্দার সজ্জিত হইল, কবি গঙ্গারাম তাহাদের নামের একটা তালিকা দিয়াছেন,—

'ধামধমা মাত্র আর হিরামন কাশী। গঙ্গাজি আমজ্জ জাএ আর সিমন্ত জোশী ॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহেড়া। সন্তুজি জাএ আর কেশোজী আমোড়া ॥
কেশব সিংহ মোহন সিংহ এ দুই চামার। যার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হাজার ॥
এই দশজনা জাএ গ্রাম লুঠিতে। আর দশজনা থাকে নবাবের চারিভিতে ॥
বালারাও শেষরাও আর শিশু পণ্ডিত। সেমন্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত ॥
মোহন রায় পীতরাএ আর শিশোপণ্ডিত। যার সঙ্গে আছে বরগী মহা বিপরীত ॥
শিবাজী সামাজি আর ফিরঙ্গরাএ। লুটিতে যাহার সঙ্গে বরগী দ্রুত ধাএ ॥
আদি * * সুনন্দন খাঁ আর ভাস্কর। এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর ॥'

কবি গঙ্গারাম এই বরগিসর্দ্দারদের নামাবলি না দিয়া যদি নবাবের সেনাপতি জমাদারদিগের নামাবলি শুনাইতেন, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষীদিগের বেশী তৃপ্তির কারণ হইত।

যাহা হউক, ভাস্কর একদিন দুই দিন করিয়া সাত দিন বর্দ্ধমান অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নগরের অবস্থাটা কবি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুনাইতেছি,—

'একদিন দুইদিন করিয়া সাতদিন হইল। চতুর্দ্দিগে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল ॥
মুদি বাণিঞা জত বারাইতে নারে। লুটে কাটে মারে ছমুতে পাএ জারে ॥
বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ। চতুর্দ্দিকে বরগীর ডরে রসদ নাহি লএ ॥
চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি। তৈল ঘি আটা চিনি লবণ একসের করি ॥
টাকা সের হইল আনাজ কিনতে নাহি পাএ। ক্ষুদ্র কাঙ্গাল যত মইরা মইরা জাএ ॥
গাঞ্জা ভাঙ্গ তামাক না পাএ কিনিতে। আনাজ নাহি পাওয়া জাএ লাগিলা ভাবিতে ॥
কলার আইঠা যত আনেন তুলিয়া। তাহা আনি সবলোকে খাএ সিজাইয়া ॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল। কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল ॥
বিষম বিপত্য বড় বিপরীত হইল। অন্য পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল ॥'

কাজেই আর ধৈর্য্য রহিল না। নবাব আক্রমণের হুকুম দিলেন; কিন্তু দিলে কি হইবে শাহী ফৌজ—নবাবী সেনা নড়িতে চড়িতে নবাবী করিবে। বরজৈই নিশান উড়াইয়া ডঙ্কানাগারা বাজাইয়া তাহারা উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিল। মহারাট্টারা বুঝিল, নবাবসৈন্য নড়িতেছে, তাহারা অবসর দিবে কেন? তাহারাও চারিদিক্ হইতে চাপিয়া আসিল—

'তখন নবাবের সেনাতে পড়িলা হড় বড়। হেন বেলাতে বহইলাতে ধরিলা ডেহর ॥
হাজার হাজার ঘোড়া উঠাএ একবারে। হারা হারা কইরা আসে কাছাইতে নারে ॥'

কাজেই আর বিলম্ব করা চলিল না,—

'তবে মুস্তাফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া লইয়া। বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহর মারিয়া ॥
তবে সামনে হইতে বরগী পলাইল। আর কত বরগি আসি পিছাড়ি ঘেরিল ॥
মীর হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল। বে-কাবুড়ি লইয়া সেহ মিসাইল ॥
পেছাড়ি লুঠিল বরগি আসিয়া বকত। পোড়াইল ডেরা ডাণ্ডা তাম্বু আদি জত ॥
খাজনার গাড়ী জত সাতে ছিল। চাইরদিগের বরগি আইসা লুঠিতে লাগিল ॥'

এই সময়ে নবাবের সেনাপতি মুসাহেব খাঁ সদলে মহারাট্টাদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া একদিগের পথ করিয়া দিলে নবাব সসৈন্যে সেই দিক দিয়া কাটোঞায় উপস্থিত হইলেন। হাজী সাহেব নৌকা করিয়া নবাবের জন্য কাটোঞায় খাদ্যাদি প্রেরণ করিলেন। শিকার পলাইল দেখিয়া ভাস্কর লুণ্ঠনে মন দিলেন। গ্রামের লোকজন ভয়ে পলাইতে লাগিল। কবি গঙ্গারাম অতি উজ্জ্বল ভাষায় এই পলায়নের বিবরণ দিয়াছেন,—

'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া। সোণারবাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়পি লইয়া ॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত। তামাপিতল লইয়া কাসারি পলাএ কত ॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি। জাউলামাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি ॥
গন্ধবণিক পলাএ করাত লইয়া কত। চতুর্দ্দিগে লোক পলাএ কি বলিব কত ॥
কায়স্থ বৈদ্য জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম সুইনা সব পলাইল ॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে। বরগির পলানে পেটারি লইয়া মাথে ॥

ক্ষেত্রি রাজপুত জত তলয়ারের ধনি। তলয়ার ফেলাইয়া তারা পলান অমনি ॥
গোসাঞি মোহন্ত জত চৌপালাএ চড়িয়া। বোচকাবুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া ॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা। বিছন বলদের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া ॥
সেক সাইয়দ মোগলপাঠান জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল ॥
গর্ব্ববতী নারী জত না পারে চলিতে। দারুণ বেদনা পাইয়া প্রসবিছে পথে ॥
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল ॥
দসবিস লোক যাইয়া পথে ডা-ড়াইলা। তা সভারে সোধায় বরগি কোথায় দেখিলা ॥
তারা সব বোলে মোরা চক্ষে দেখি নাই। লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই ॥
কাঙ্গাল গরিব জত জাএ পলাইঞা। কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিঞা ॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি। চাঞি ধানুক পলাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি ॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল। বরগির ভয়ে সব পলাইল ॥'

তারপর বরগি পলাতক জনের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। লুটপাট ছাড়া কবি বলিতেছেন,—

'কারু হাত কাটে কারু কাটে নাক কান। একি চোটে কারু বধএ পরাণ ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ। আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেএ তার গলাএ ॥
একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে। * * * * * *
এই মত বরগি কত পাপকর্ম্ম কইরা। সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেএ সব ছাইড়া ॥'

তারপর গ্রামে ঢুকিয়া গৃহদ্বার পোড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন অনেকে গঙ্গা পার হইয়া রক্ষা পাইল। ভাস্কর কাটোঞার নিকট যে সকল গ্রাম পোড়াইয়া দিয়াছিলেন, কবি গঙ্গারাম তাহার একটি ফর্দ্দ দিয়াছেন,—

'চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগনগর। ক্ষিরপাই পোড়াএ আর বর্দ্ধমান সহর ॥
নিমগাছি সেড়গাঁ আর সিমইলা। চণ্ডীপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা ॥'

তারপর—

'এই মতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চারিভিতে। পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে ॥
পির খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল। তাহার কারণে বরগি লুটিতে নারিল ॥'

এই পীর খাঁ ফৌজদার কি কৌশলে বরগীকে বিমুখ করিলেন, কবি সেটুকু লিখিলেন না, ইহা ক্ষোভের কথা বটে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি, ভাস্করের সেনাপতি শিবরাও হুগলীতে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। এই রাজস্ব আদায়ের সংবাদ শুনিয়াই কলিকাতায় ইংরাজেরা ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মহারাট্টা-নালা খনন করান এবং সহরের সমস্ত ফিরিঙ্গী ও আরমানিদিগকে লইয়া অবৈতনিক সৈন্য দল গঠন করেন। ভলান্টিয়ার সৈন্যের উৎপত্তি এইরূপে হয়।

তারপর ভাস্কর রাঢ়ের যে সকল গ্রাম ছারখার করেন, কবি তাহার একটি তালিকা

দিয়াছেন। এই তালিকায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, বীরভূম এবং হুগলী জেলার বিস্তর গ্রামের নাম দেখা যায়। সে তালিকা অতি দীর্ঘ, সেজন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। কাগামোগা নামক স্থানে ওলন্দাজের কুঠি ছিল, তাহাও লুটিয়া লইয়াছিল। শেষে বরগিরা জেমোকান্দী ডাহাপাড়া পোড়াইয়া হাজিগঞ্জের ঘাটে পার হইয়া বরগিরা মুরশিদাবাদে ঢুকিয়া জগৎশেঠের বাড়ী লুটিল। হাজি আহম্মদ ও নোয়াজিস মহম্মদ কেবল মাত্র কোন ক্রমে নবাবের কেল্লা রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন,—

'হাজি আর ছোট নবাব উপরে ছিল। বরগির নাম শুইনা কিল্লাএ সাধাইল ॥'

নবাব তখনও কাটোঞায়। মুরশিদাবাদ লুঠের কথা শুনিয়া তিনি শীঘ্র সহরে আসিলেন। নবাবের আগমন জানিতে পারিয়া ভাস্কর সরিয়া পড়িল। জগৎশেঠের বাড়ী লুঠিয়া ভাস্কর বড় কৌশলে নগর ত্যাগ করেন। কবি গঙ্গারাম বলিতেছেন,—

'তবে বরগি পার হইলা হাজিগঞ্জের ঘাটে। শীঘ্রগতি আইলা জগৎসেঠের বাড়ী লুটে ॥
আড়কটি টাকা জত ঘরে ছিল। ঘোড়ার খুরচি ভরি সব টাকা নিল।
তবে সও দুই তিন টাকা ছিটাইঞা। শীঘ্রগতি গেলা বরগি গঙ্গাপার হইয়া ॥
তবে ফকির ফকিরা গিরস্ত জত ছিল। সেই সব টাকা তারা লুঠিতে লাগিল ॥'

এইরূপে নগরের লোককে অন্যমনস্ক রাখিয়া নিজামত কেল্লার আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য ভাস্কর গঙ্গা পার হইয়া গেল। এক জগৎশেঠের কুঠি লুটিয়া আড়াই কোটী টাকা পাওয়ায় আর অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া ভাস্কর এই কৌশলে পলাইল।

নবাব কাটোঞা ছাড়িয়া আসিবার পর ভাস্কর সদলে কাটোঞায় গিয়া জমিল এবং কাটোঞা, ভাওসিংহের বেড়া ও দাঁইহাট জুড়িয়া ছাউনি করিয়া বসিল। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, আর লুটপাট চলে না, কাজেই ভাস্কর তখন চারিদিকে খাজনা আদায় করিতে লাগিল। জমীদারেরা আসিয়া মিলিল এবং—

'গ্রামে গ্রামে চর তাগিদায় গেল। তারা সব জাইয়া খাজানা সাদিতে লাগিল ॥'

ইহার পূর্ব্বে মীর হবিব বর্দ্ধমানের যুদ্ধে বরগির হস্তে বন্দী হন। তিনিই এখন ভাস্করের বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার পরামর্শে গঙ্গায় নৌকার পুল বান্ধিয়া সৈন্য পারের ব্যবস্থা হইল। দাঁইহাটের ঘাট পর্য্যন্ত পুল বাঁধা হইল। ইহা আশ্বিন মাসের পূজার সময়ের কথা। বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে তখন দুর্গোৎসবের ধুম দেখিয়া ভাস্কর পণ্ডিতও দুর্গোৎসবের আয়োজন করিল। জমীদারদিগকে ডাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া মহা ধুমধামে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল। একদিন রাত্রিতে বরগিরা সেই পুল বাহিয়া এপারে ফুটিসাকো নামক স্থানে আসিল, নবাব সে কথা শুনিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া—

'ষাট হাজার ঘোড়া আর ডেড় লাখ বহনিয়া। তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া ॥'

এই সকল ফৌজের সঙ্গে যে সকল ফৌজদার আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঠাকুর সিংহ নামে একজন হিন্দু সেনাপতির নাম আছে। এত বৃহৎ নবাবী সেনা তারকপুরে আসায় ভাস্কর সদলে

পিছাইতে লাগিল। নবাবী সেনা পশ্চাদ্ধাবন করিল। পলাশী পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া গেলে, পলাশীর বরগীরাও পলাইল এবং পুলপার হইয়া পুল কাটিয়া দিয়া গেল। নবাব নিজে বহনপুরে পঁহুছিয়া চারিদিকে তোপ সাজাইয়া "মুরচা লাগাইয়া" বসিলেন। পূর্ণিয়া হইতে ছোট নবাব বাহাদুর ও পাটনা হইতে জইনুদ্দীন আহম্মদকে সসৈন্যে আসিতে লেখা হইল। তাঁহারা আসিলে জইনুদ্দীন অবিলম্বে আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, নবাব কিন্তু বর্ষার জলকাদা শুকাইবার অপেক্ষা করিতে বলিলেন। জইনুদ্দীন বলিলেন,—

জলকাদা শুকাইলে বরগীর হবে বল। চতুর্দ্দিকে লুটিবে পোড়াবে সকল॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকাএ করিয়া। রাতারাতি যেন বরগি মারে গিয়া॥

মীর হবিব এ সংবাদ পাইয়া নবাবকে ফৌজ পারের অবসর না দিয়াই—

বড় বড় কামান আইনা থুইলা থরে থরে। হুগলি হইতে সুলুক আনে তার পরে॥
তবে গোলন্দাজে গোলা দাগিতে লাগিল। মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল॥
জেইমাত্র গোলা আইসা ফৌজে পড়িল। তখন নবাব সাহেবের লোক উমনি পিছাইল॥

মীর হবিবের কৌশল সফল হইয়াও হইল না, কামানটা ফাটিয়া গেল, সুলুকের তলা ফুটা হইয়া গেল। এ সংবাদ নবাব শিবিরে যেমন পৌছিল, অমনি নবাব ফৌজ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। মশাল জ্বালিয়া সেনা কুচ করিয়া নদীর তীরে আসিয়া পৌছিল। জইনুদ্দীন উদ্ধারণ পুরে আসিয়া বড় বড় পাটেলি নৌকা "জুড়িন্দা" বান্ধিয়া "গুদারা" লাগাইয়া দিলেন। ফৌজ তাহার উপর দিয়া পার হইয়া অজয়ের তীরে গেল। সেখানেও আবার জুড়িন্দা বাঁধিয়া লইল। রতন হাজারী বাইশ শত ফৌজ লইয়া "পাটেলি" চড়িয়া যখন পার হইবে, অমনি কতকদূরে পাটেলি তলা ফাটিয়া ডুবিয়া গেল। তখনও বরগী নিশ্চিন্ত, তবে তাহারা সংবাদ রাখিতে ছিল। রতন হাজারির দল সাঁতারাইয়া ডাঙ্গায় উঠিবামাত্র হঠাৎ বরগীর শিবিরে "বহনিয়া"-দলে মোগল আসিল বলিয়া একটা কলরব উঠিল; সকলে ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল, ভাস্কর পণ্ডিত সে পলায়নে বাধা দিতে পারিলেন না। অষ্টমীর রাত্রিতে ভাস্কর প্রতিমা ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সে যাত্রা কাটোএা হইতেই ফিরিলেন। ভাস্কর পুনরায় সসৈন্যে চৈত্রমাসে আসিলেন। এবার আসিয়া লুঠের অপেক্ষা হত্যার মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলেন। কবি এখানে নিজের কাব্যের সূত্রপাতের সঙ্গে পরিণামে সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

ব্রাহ্মন বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল। গোহত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল॥
হাজার হাজার পাপ করিল দুর্ম্মতি। লোকের বিপত্য দেইখ্যা রুষিলা পার্ব্বতী॥
পাপিষ্ট মারিতে আদেশিলা পশুপতি। ব্রাহ্মন বৈষ্ণব হত্যা কৈলা পাপমতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি। এতেক কহিয়া তবে রুষিলা শঙ্করী॥
ভৈরবী জোগিনী যত নিকটে ছিল। জোড়াহস্ত কইরা তারা ছমুতে দাড়াইল॥
তবে দুর্গা কহে শুন জতেক ভৈরবী। ভাস্করকে বাম হইএা নবাবকে সদয় হবি॥

এন্তেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন। এখন যেরূপে ভাস্কর মইল শুন বিবরণ ॥

আমরাও তাই বলি যে—দেবতাদের ব্যবস্থা দেবতারা যাহাই করুন আর তদ্দ্বারা কবি গঙ্গারামের কাব্যশক্তি যতই কেন প্রকাশ হউক না, এখন ইতিহাসটা শেষ করা আবশ্যক।

ভাস্কর এ যাত্রাতেও আসিয়া কাটোঞায় ছাউনী করিলেন। নবাব শুনিয়া মনকরাতে আসিয়া ছাউনী করিলেন। আলীভাই নামে একব্যক্তি ভাস্করকে পরামর্শ দিলেন এবার আর লুঠে কাজ নাই। বারবার আসিয়া সৈন্যক্ষয় করিয়া কি হইবে? নবাবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেল। ভাস্কর সম্মত হইলেন। আলীভাই পঁচিশ জন সওয়ার লইয়া ফুটি-সাকোতে আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নবাব-শিবিরে লোক পাঠাইলেন। নবাব নিরস্ত্র হইয়া আলীকে আসিতে আদেশ দিলেন, নিরস্ত্র হইয়া সওয়ার লইয়া আলিভাই আসিলেন ও বন্দোবস্তের প্রার্থনা করিলেন। নবাব বর্দ্ধমানের কথা তুলিয়া বলিলেন, আমি যখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তখন তোমরা এ কথাটা কাণে তুল নাই। শুনিয়া

"আলিভাই বোলে জাহা হবার তা হইল। কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল ॥

দুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে। ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এইস্থানে ॥"

ইহা শুনিয়া নবাব জানকীরাম ও মুস্তাফা খাঁকে সঙ্গে দিলেন। ভাস্করও আসিতে সম্মত নহেন, মীর হবিবও পরামর্শ দিলেন না। শেষে মুস্তাফা খাঁ নিজে কোরাণ ও জানকীরাম গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া জামীন হওয়ায় ভাস্কর স্বীকৃত হইলেন। ১লা বৈশাখ শুক্রবারে ভাস্কর কাটোঞা হইতে যাত্রা করিলেন। ২রা তারিখে মনকরা-শিবিরে দরবারে নিরস্ত্র হইয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব পুরাতন কথা পাড়িলেন।

"এতেক শুনিঞা ভাই আলি কহিল। এতদিন যাহা হবার তাহা হইল ॥

ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলু তোমার স্থানে। কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার সনে ॥"

তার পর কবি যেটুকু লিখিয়াছেন সেটুকু বেশ হাসির কথা,—

"এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেক হাসি। খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি ॥"

এইরূপে নবাব "লঘ্যি" অর্থাৎ please let me go outএর ছুতা করিয়া উঠিয়া গেলেন। ষড়যন্ত্র পূর্ব্বেই স্থির ছিল। কতক্ষণ বসিয়া ভাস্কর বলিলেন, তবে আমিও স্নানপূজায় যাই। মুস্তাফা খাঁ বলিলেন, চল সকলেই যাই, "সে-পহরে আসিব নবাবের ঠাঞি।" তাহার পর—

জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়াএ চড়িতে। তলয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে ॥

সেইক্ষণে তবে খটাবট্টি হইল। যতগুলা আইসা ছিল সবগুলা মইল ॥

তারপর নবাব শিবিরে আনন্দ হইল, ফকীর ফকরাণ খাইল, বাজনা বাজিল, নিশান উড়িল আর কবি গঙ্গারাম গ্রন্থ সমাপন করিয়া বলিলেন,—

মনকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল। মনস্থরা দউড়াইয়া কবি গঙ্গারামে কইল ॥

ইতি মহারাষ্ট্র-পুরাণে প্রথমকাণ্ডে ভাস্করপরাভব। শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ই পৌস রোজ সনিবার।

কবি গঙ্গারামের কাব্য-কথা এই পর্য্যন্ত। ইহা তাঁহার প্রথমকাণ্ড, এই পুরাণের দ্বিতীয়াদি কাণ্ড আর লেখা হইয়াছিল কি-না জানি না। ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃঃ) আলীবর্দ্দী খাঁ নবাবের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রথম আগমন হয়। ভাস্করের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসরেই বিদ্রোহ দমন হয়; সুতরাং আমাদের আলোচ্য কাব্যখানি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিত বলিলেও বলা যায়। বর্ত্তমান পুঁথিখানিও ঘটনার আট বৎসরের মধ্যে লেখা; সুতরাং এ পুথিখানি কবির নিজের মূল পুস্তক না হইলেও তাঁহার সমসাময়িক গ্রন্থ। কবি গঙ্গারাম এই কাব্যে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার বিশেষ অসামঞ্জস্য নাই। একটা প্রধান ঘটনা কেবল মিলিল না। বর্দ্ধমানসহরে নবাব সসৈন্যে যে ভাস্কর পণ্ডিতকর্ত্তৃক সাত দিন অবরুদ্ধ ছিলেন, তাহা মুতাক্ষরীণ, তারিখী-বাঙ্গালা বা হলওয়েলের বিবরণীতেও নাই। আমাদের কালীপ্রসন্ন বাবুও তাঁহার নবাবী আমলের ইতিহাসে সে কথা বলেন না। তবে নবাব সৈন্য যে অন্নহীন হইয়া কলাগাছের এঁঠে সিদ্ধ করিয়া খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা অতিশয়োক্তি নহে। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাব বর্দ্ধমান হইতে সত্তর ক্রোশ দূরে কাটোওয়াতে যে কষ্টে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং নিরন্ন অবস্থায় যেরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহা তারিখী-ইউসুফীর গ্রন্থকার ইউসুফ আলীর কথা হইতে কালীপ্রসন্ন বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল,*—

বাঙ্গালা ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) আলীবর্দ্দি খান, বাঙ্গালার নবাবী অধিকার করেন। একবৎসরের মধ্যে রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য নিজ মনোমত লোকজন নিযুক্ত করিয়া সুজাউদ্দীনের জামাতা মুরশিদকুলী খান্‌কে (২য়) কটক হইতে উচ্ছেদ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক মাস অবরোধের পর মুরশিদকুলীর জামাতা বাকর খান্ একদিন যুদ্ধে আহত হইলে, মুরশিদকুলী পরাজিত হইয়া মছলীবন্দরে পলায়ন করিলেন। আলীবর্দ্দির জামাতা সৈয়দ আহম্মদ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মুরশিদকুলী খানের অনুকূলপক্ষ আবার বিদ্রোহী হয়। নবাব আবার উড়িষ্যায় গিয়া তাহা দমন করেন এবং জামাতার সঙ্গে মাসুম খান্‌কে প্রতিনিধি রাখিয়া আসেন। ১১৪৯ সালের শেষে নবাব মন্দ-গমনে রাজধানীতে ফিরিতে লাগিলেন। পাঁচ হাজার সেনা সঙ্গে রাখিয়া নবাব আর সকলকে বিদায় দিলেন। মেদিনীপুরের দক্ষিণে আসিয়া নবাব শুনিলেন, পঞ্চকোটের পার্ব্বত্যপথ দিয়া চল্লিশহাজার সেনা লইয়া নাগপুরের অধীশ্বর রঘুজী ভোঁস্‌লের রণনিপুণ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালার রাজস্বের "চৌথ" আদায়ের অভিলাষে বর্দ্ধমানের দিকে চলিয়াছে। উভয়দলের মধ্যে কেবল কুড়িক্রোশ মাত্র ব্যবধান, পরদিন হয়ত মহারাট্টারা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নবাবের শিবিরের কাছে আসিতে পারে। নবাব মনে মনে চিন্তিত হইয়াও মুখে সাহস প্রকাশ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে জানা যায়,

* অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস ১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহার পর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় "বঙ্গে বর্গী" নামে একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে খানিও দ্রষ্টব্য।

উড়িষ্যার দেওয়ান মীর হবিব খান্ মাহারাট্টাদিগকে বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। হলওয়েলের বর্ণনা হইতে জানা যায়, মাহারাট্টাযুদ্ধের সন্ধি অনুসারে মাহারাট্টাগণ দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্‌র নিকট দুই বৎসরের বাকী চৌথ চাহিয়া পাঠায়, কিন্তু বাদশাহ্ বলেন, বাঙ্গালার সুবাদার বিদ্রোহী, সে কোন রাজস্বই এখানে পাঠায় না, অতএব তোমরা গিয়া সুবাদারকে দমন করিয়া চৌথ আদায় করিয়া লইতে পার। ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হয়। ইহার দুই বৎসর পরে ভাস্করপণ্ডিত বাঙ্গালায় আসেন।*

নবাব তাহার পর বুঝিলেন যে যদি মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে স্বদলে আক্রান্ত হইতে হয় তবে অবরোধে পড়িয়া খাদ্যাভাবে মারা পড়িতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত বর্দ্ধমানে রাওয়ানা হইতে আদেশ দিলেন। বর্দ্ধমানে আসিয়া দেখিলেন, বরগীরা তাঁহার পূর্ব্বে আসিয়া নগরের একাংশ পুড়াইয়া দিয়াছে। নবাব আসিতেই, তাহারা একটু দূরে সরিয়া গেল। শেষে উভয় দলে যুদ্ধ হইতে লাগিল। জয় পরাজয় নাই, প্রত্যহ প্রাতে যুদ্ধ হয়, সন্ধ্যায় উভয় দল যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া শিবিরে ফেরে। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের যুদ্ধরীতি দেখিয়া জয়ের আশা ছাড়িয়া কিছু টাকা লইয়া ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি নবাবকে জানাইলেন, মহারাট্টারা বহুদূর হইতে অর্থের আশায় আসিয়াছে, নবাব দশলক্ষ টাকা দিলেই ফিরিয়া যাইবে। মুস্তাফা খান্ তখন নবাবের সঙ্গী সেনাদলের সেনাপতি। তাঁহার প্রস্তাবে নবাব ইহাতে সম্মত হইলেন না। কাজেই লঘুযুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, চলিতে লাগিল। একদিন নবাব সমস্ত সেনা লইয়া বিপুলবেগে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু সৈন্যচালনায় বিশৃঙ্খলা হওয়ায় মহারাট্টাগণের সুবিধাই হইতে লাগিল। তাহারা কৌশলে নবাব-বেগমের হস্তী ঘিরিয়া ফেলিল। মুসাহেব খান্ নামে একজন সেনাপতি অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া বেগমদিগকে উদ্ধার করেন। নবাব লক্ষ্য করিলেন, মুস্তাফা খান্ যুদ্ধে তেমন মনোযোগী নহেন। নবাবী-শিবিরের দ্রব্যাদি সমস্ত শত্রু-হস্তগত হইয়াছে। যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে অগ্রসর হইবার বা ফিরিয়া শিবিরে যাইবার উপায় নাই। একটি তাম্বু ও তিন চারিখানি শিবিকা ভিন্ন তখন নবাবের নিশাযাপনের অন্য আশ্রয় নাই, কাজেই নবাব দশলক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। ভাস্কর অবস্থা বুঝিয়া এককোটী টাকা চাহিলেন এবং নবাবের অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়া প্রচার করিলেন, নবাবপক্ষের যে কেহ মহারাট্টার দলে আসিতে চাহ, এস, আমি আশ্রয় দিব। সন্ধ্যার সময়ে নবাবের দলের অনেকে বরগীর দলে গিয়া মিলিল। উড়িষ্যায় যুদ্ধের সময় আলীবর্দ্দি খান্ মুস্তাফা খানের কয়েকটি অনুরোধ রাখেন নাই বলিয়া মুস্তাফা খান্ আলীবর্দ্দির উপর চটিয়া ছিলেন। এই

---

* এই পর্য্যন্ত কবি গঙ্গারামের বর্ণনার সহিত ইতিহাসের মিল আছে, কিন্তু মহারাষ্ট্রীর ইতিহাসের বিবরণটাও একটু বিচার করিয়া দেখিবার কথা। মহারাষ্ট্র যুদ্ধে বাদশাহের সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাহা পেশবার সহিতই হইয়াছিল; চৌথের দাবী করিলে তিনিই করিবেন, নাগপুরের ভোঁসলে রঘুজী তাহার অধিকারী নহেন সুতরাং চৌথের জন্য ভাস্করের আগমন ঠিক নহে, তবে ঐ উড়িষ্যার মীর হবিব খানের আহ্বান রক্ষা করা একবারে অসম্ভব না হইতে পারে।

তাঁহার শোধ লইবার সময়। আলীবর্দ্দি ইহা বুঝিতে পারিয়া, সেনাপতিকে শান্ত করিবার জন্য বালক সিরাজকে লইয়া রাত্রিতে মুস্তাফা খানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন ও নিজ দৈন্য জানাইয়া তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। মুস্তাফা অন্যান্য সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া নবাবকে ভরসা দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নবাব অমিততেজে বিপক্ষ মধ্য দিয়া স্বদলে যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাবের প্রত্যাবর্ত্তন ব্যাপার অতীব ভীষণ ব্যাপার। পূর্ব্বদিন সেনারা অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছে, রাত্রিতে মাহারাট্টার বিজিত কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহার উপর দশ বার ক্রোশব্যাপী লুণ্ঠিত ভস্মীভূত গ্রামনগরাদির মধ্য দিয়া অনাহারে যুদ্ধ করিতে করিতে ফিরিতে হইতেছে! এই দুর্দ্দশার অবস্থা বুঝিয়া বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান রাজা মাণিকচাঁদ প্রত্যুষেই পলায়ন করিলেন। গ্রামনগরে লোক নাই, সকলে বরগীর ভয়ে পলাইয়াছে, কাজেই আহার্য্য মিলিবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা অনেকে বৃক্ষপত্র, বল্কল, পিপীলিকাদি ধরিয়া খাইতে লাগিল। নবাব তিনদিন উপবাসী; তৃতীয় দিবসে তিনপোয়া মাত্র খিচুড়ী সংগৃহীত হইলে তাহা সাতজনে ভাগ করিয়া খাইতে হইল। একদিন নবাবীসেনাদল রন্ধননিযুক্ত মহারাষ্ট্রীয়গণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি খাইয়া ফেলিল। তিনদিন পরে সকলে কাটোয়ায় পঁহুছিয়া দেখিলেন, মহারাট্টারা আগে আসিয়া নগর ও শস্যভাণ্ডার পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নবাবীসেনা সেই দগ্ধশস্য অমৃত মনে করিয়া খাইতে লাগিল। এই সময়ে মুরশিদাবাদ হইতে আহার্য্য ও সাহায্য আসায় নবাবীসেনার অবস্থা ফিরিল। এই সময়ে বর্ষাও আসিয়া পড়িল। মীর হবিব খান্ ইতিপূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রদলে প্রকাশ্যতঃ যোগ দিয়াছিলেন। নবাব যখন কাটোয়ায়, তখন পরামর্শ করিয়া মীর হবিব খান একদল সেনা লইয়া মুরশিদাবাদের পশ্চিম ডাহাপাড়ায় গিয়া অগ্নিদান ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন; পরে গঙ্গাপার হইয়া জগৎশেঠের কুঠি লুঠিয়া দুইকোটী টাকা ও অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত করিলেন। হাজী আহাম্মদ ও নওয়াজিস কেবল কেল্লাটি রক্ষা করিতে পারিলেন, আর কিছু পারিলেন না। পরদিন প্রাতে নবাব মুরশিদাবাদে আসিয়াছেন জানিয়াই মীর হবিব সদলে কাটোয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ইহা ১১৪৯ সালে (১৭৪২ খৃষ্টাব্দের) প্রথমে ঘটে।

মহারাট্টারা কাটোয়ার উত্তরে অজয় পারে সাঁকাই নামক পল্লীতে এক মৃণ্ময় দুর্গ ও গড়বেষ্টিত ফৌজদারের বাড়ী অধিকার করিয়া বর্ষা কাটাইবার ব্যবস্থা করিল। এখান হইতে তাহারা মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমান, হুগলী, রাজশাহী, রাজমহল প্রভৃতি স্থান লুঠিতে লাগিল। মুরশিদাবাদের লোকেরা, মালদহ, রামপুর-বোয়ালিয়ায় চলিয়া গেল। নবাবও পরিবারবর্গকে পদ্মাপারে গোদাগাড়ীতে পাঠাইলেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকেরও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইল। কাটোয়া ও বর্দ্ধমানের দক্ষিণ লোকাভাবে জঙ্গল হইয়া উঠিল।

হুগলীতে বরগীরা একটা প্রধান আড্ডা করিল। মীরহবিব খানের পরামর্শে শিবরাও নামে মহারাট্টা-সর্দ্দার রাজস্ব আদায় আরম্ভ করিতে লাগিল। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের

লোকেরা কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ইংরাজেরা এই সময়ে কলিকাতার তিন দিকে গড় কাটাইতে লাগিলেন। ইহাই মহারাষ্ট্রনালা। এই কাজে মজুরেরা বেতন লয় নাই। অন্যান্য ব্যয় নগরবাসীরা চাঁদা করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজেরা এই সময়ে সহরের ইউরোপীয়, আর্ম্মাণী এবং ফিরিঙ্গীদিগেকে লইয়া ভলণ্টিয়ার সেনাদল গঠিত করিলেন। চাঁদা ও ভলণ্টিয়ারের এই সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে বেহার হইতে নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দীন সসৈন্যে যোগ দিলেন। বর্ষাশেষে নবাবী সেনা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইল। রাত্রিতে নৌসেতু করিয়া নবাবী সেনা কাটোয়া পার হইল। দুই তিন হাজার সেনা পার হইলে সেতু ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা হউক আবার সেতু-নির্ম্মিত ও মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পঞ্চকোটের পথ দিয়া উড়িষ্যায় পলাইল। ইহা ১১৪৯ সালের আশ্বিনের ঘটনা। এই যুদ্ধে মুস্তাফা খান্ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িষ্যায় মাসুম খানুকে নিহত করিয়া দেশে চলিয়া গেল। হলওয়েল বলেন শিবরাও ধরা পড়েন এবং তাঁহারা সাহায্যে পেশবা বালাজীরাওএর সহিত সন্ধি হয়। ইহার পর ১১৪৯ সালের শেষে (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) বালাজীরাও স্বয়ং ১১লক্ষ টাকা চৌথের জন্য বেহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রঘুজী ভোঁসলেও এই সময়ে নিজে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলেন। বালাজীরাও সন্ধি অনুসারে নবাবকে সাহায্য করিতেই আসিতেছিলেন। বেহারের চৌথ দিয়া আলীবর্দ্দি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময়ে রঘুজী বর্দ্ধমান অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। নবাবী-সেনা ও বালাজীর মহারাষ্ট্রীয় সেনা একত্র তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। রঘুজী এবার অসুবিধা বুঝিয়া বর্দ্ধমান হইতেই পলাইলেন। পরবর্ষে রঘুজী ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠাইলেন, ভাস্করের উদ্দেশ্য চৌথ আদায় নহে, লুণ্ঠনে উপার্জ্জন, কাজেই ভাস্কর বেশী অগ্রসর না হইয়া পশ্চিম-বাঙ্গালার নানাস্থানে লুঠিতে লাগিল। আলীবর্দ্দী ইহাতে বিপন্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন, কারণ এবার ভাস্কর যুদ্ধ করিতে চাহে না, এক স্থানে তাড়া দিলে অন্য স্থানে সরিয়া গিয়া লুঠ করে। কাজেই মন্ত্রী জানকীরাম ও মুস্তাফাকে পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা নবাবের শিক্ষানুসারে কৌশলে ভাস্করকে মনকরা নামক স্থানে নবাব দরবারে লইয়া আসিলেন। ভাস্কর দরবারে আসিলে লুক্কায়িত সেনারা তাহাকে হত্যা করিল। বাহিরে ভাস্করের অনুচর মহারাষ্ট্রসেনাদল অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা নবাবী সেনাদ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পলাইল। ১১৫০ সালে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) ভাস্কর নিহত হন।

ইতিহাসের এই পর্য্যন্ত আমাদের মহারাষ্ট্র-পুরাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পাঠকগণ দেখিবেন, ইহার সহিত কবি গঙ্গারামের একটী কথারও অমিল নাই।

গঙ্গারামের কবিতার মধ্যে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকের পরিচয় উপরের লিখিত বিবরণে পাইয়াছেন। বাকী কয়েক জনের মধ্যে রাজারাম সিংহ নবাবের চরের অধ্যক্ষ ও মেদিনীপুরের ফৌজদার ছিলেন। ইহারই নিযুক্ত লোকে দেশের

সর্ব্বত্র ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। সমশের খান্ আলীবর্দ্দীর একজন সেনাপতি ছিলেন। যে যুদ্ধে সরফরাজ খানের পতন হয়, সেই যুদ্ধে মীরহবিব খান্, রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ ও সমশের খান্ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মীর উমের খান্ও একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। সিরাজের সময় যে দিলীর খান্ ও আসালত খান্ সওকত জঙ্গের যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহারা এই মীর উমের খানের পুত্র। এতদ্ভিন্ন আর কাহারও পরিচয় তেমন কিছুই পাওয়া যায় না।

ভাস্করের দুর্গোৎসবের কথা কোন ইতিহাসে নাই, কিন্তু তাহা যে ঘটে নাই, তাহা বলিবারও কোন প্রমাণ নাই, কারণ কবি গঙ্গারাম হিন্দু এবং সমসাময়িক কবি। তাঁহার সাক্ষ্য এ বিষয়ে অধিক গ্রহণীয়। সময়ামিয়িক মুসলমান ইতিহাসলেখকের পক্ষে এ পুতুল-পূজার ব্যাপার অকিঞ্চিৎকর বোধে লিপিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে অগ্রাহ্য হওয়া কিছু অন্যায় নহে।

গ্রন্থের কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠতা বিশেষ কিছু নাই। বর্গীর অত্যাচার বর্ণনা করিতে তিনি যে আলঙ্কারিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাব্যরস না ছড়াইয়া সাদাসিধা কথায় ঘটনার সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে ভাস্করের দ্বিতীয়বার আক্রমণে তাঁহাকর্ত্তৃক গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও স্ত্রী হত্যার যেরূপ অবাধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি বলিয়াই বোধ হয়।

অতঃপর এই গ্রন্থের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পুথি-খানির অধিকাংশ স্থানেই রাঢ়ের উচ্চারণসুলভ আনুনাসিক ক্রিয়া পদের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে রাঢ়ের লোক বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায় আর সে অনুমান আমার নিজের পক্ষে এতটা দৃঢ় যে, আমি তাঁহাকে রাঢ়ীয় লোক বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছি না। একটা কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য,—পুথিখানি আমরা ময়মনসিংহে পাইয়াছি, সুতরাং এখানি যে পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন লোকের নকল করা পুথি তাহাতেও সন্দেহ নাই আর তাহার প্রমাণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। অধিকাংশ স্থলেই রাঢ়ীয় উচ্চারণসুলভ আনুনাসিক ক্রিয়া পদের মধ্যে মধ্যে দুই চারিটির বানান আবার পূর্ব্ববঙ্গ-সুলভ স্বরবিস্তৃতি যুক্ত। স্বর-ব্যত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদেরও প্রয়োগ আছে যথা,—

(১) লোকের বিপত্য দেইখ্যা রুষিলা পার্ব্বতি।
(২) যেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পড়িল।
(৩) বরগির নাম সুইনা সব পলাইল।

পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকের হাতে নকল হওয়াতে রাঢ়ীয় উচ্চারণের অনেকগুলি ক্রিয়াপদের বানানও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যথা,—

(১) বোচা বুচ্কি লয় যত বাহুকে করিয়া।
(২) বিছন বলদের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া।

আর একটি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে রহস্য আমি এই গ্রন্থে লক্ষ্য করিয়াছি।

অধিকাংশ স্থলে এই পুথিতে শ ও ষ এর স্থানেই স ব্যবহৃত হইয়াছে। "জ" "য" স্থানে সর্ব্বত্র 'জ'ই ব্যবহৃত হইয়াছে। ই-কারের প্রয়োগই বেশী। ণ-কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে; কিন্তু 'য়'কার স্থানে 'অ'কারের প্রয়োগ তত বেশী নহে। প্রথমভাগে কিছু কিছু আছে শেষের দিকে আদৌ নাই।

'য়া'কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলি রাঢ়ীয় উচ্চারণে সর্ব্বত্র ঞ তে আকার দিয়া লেখা হইয়াছে—পাইঞা করিঞা পাঠাইঞা ইত্যাদি। কোন কবির সময়ের এত নিকটবর্ত্তীকালের কোন পুস্তক আমরা এপর্য্যন্ত পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই পুথিতে অধিকাংশ কথার রাঢ়ীয় উচ্চারণ অনুসারে বানান দেখিয়া আমার মনে হয়, রাঢ়ীয় কবিরা ব্যাকরণে লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা উচ্চারণের প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া বানান লিখিতেন। আবার রাঢ়ীয় পুস্তক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর পঠনার্থ লিখিত হইলে বোধ-সৌকর্য্যার্থে তাহার বানান পরিবর্ত্তন করিয়া লেখা হইত। তাহার আভাস ও প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুথির ছাপার সময় বানান নির্ণয় করিতে বড় বিপদে পড়িতে হয়। একখানি পুথির সর্ব্বত্র একই শব্দের একই প্রকার বানান পাওয়া যায় না। পরিষদে যে সকল গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ ব্যাপার যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই পুথি-খানিতে য়ামি ও আমি দুইরূপ প্রয়োগই আছে। বরগি ও বর্গী দুইরূপই আছে। আবার দেইখ্যা, দেইখা, দেখিয়া দেখিঞা এই চতুর্ব্বিধরূপই আছে,—এ সকলের সামঞ্জস্য করার উপায় কিছু হয় কি না, আমি জানি না। নকার স্থানে সর্ব্বত্র 'ন' কারের প্রয়োগ এবং যকার স্থানে সর্ব্বত্র 'জ'কারের প্রয়োগ ও শকার স্থানে সর্ব্বত্র 'স'কারের প্রয়োগ, যাঁহারা প্রাচীন রীতি বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কি আমি তাহা জানি না, কিন্তু কোন পুথিতে তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া দেখিতে পাই না। এ পুথিতে অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের মত সমর্থিত হইয়াছে বলিতে পারি; কিন্তু সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত বা দেশজ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে ব্যাকরণসিদ্ধ বানান পরিবর্ত্তন করিয়া মুদ্রিত করা উচিত কি না তাহা মীমাংসার বিষয়; যেমন এই পুথিতে "যদি" শব্দটি সর্ব্বত্র "জদি" এই বানানে লিখিত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন বা রক্ষণ কোনটী প্রার্থনীয়, তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

যাক্ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপর আর বেশী বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় এই পুথিখানি যেমন আছে সেইমত বানানে ছাপাইয়া দিলাম, এখন এসম্বন্ধে মনীষীরা আলোচনা করিলে সুখী হইব।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ

প্রথম কাণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।[১]
রাত্র দিন ক্রুড়া[২] করে পরস্ত্রী লইঞা ॥
শ্রীঙ্গার[৩] কৌতুকে জিব[৪] থাকে সর্ব্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন ॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে ॥
এত জদি[৫] পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
পাপের কারনে[৬] পৃথি[৭] ভার সহিতে নারে ॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর।
কহিতে লাগীলা[৮] পৃথি ব্রহ্মা বরাবর ॥
পাপের কারনে প্রভু পৃথী[৯] হইল ভারি।
কত ব্যাম[১০] পাব আমী[১১] ভার সহিতে নারি ॥

১। হইঞা—হইয়া। রাঢ় (পশ্চিমরাঢ়) দেশের উচ্চারণে "য়া" অসমাপিকা ক্রিয়া-গুলির আকার "ঞা" হইয়া যায় এবং সেই অনুনাসিক উচ্চারণ "ঞ" বর্ণদ্বারা প্রাচীন পুথিতে লিখিত হইয়া থাকে।

২। ক্রুড়া—ক্রীড়া। ৩। শ্রীঙ্গার—শৃঙ্গার। ৪। জিব—জীব।

৫। জদি—যদি। এই পুথিখানির অধিকাংশ স্থলে "য" স্থলে "জ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। কারনে—কারণে। সর্ব্বত্র "ণ"কার স্থানে "ন" ব্যবহৃত হয় নাই, তৃতীয় চরণে "ক্ষণ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

(৭) পৃথি—পৃথ্বী।

(৮) লাগীলা—লাগিলা। এরূপ হ্রস্ব-ইকার স্থানে দীর্ঘ-ঈকারের প্রয়োগ খুব অল্প, প্রত্যুত অধিকাংশ ঈ-কার স্থানেই ই-কার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা তৃতীয় চরণে "জিব" শব্দ ও দ্বাদশচরণে "আমী" শব্দ দ্রষ্টব্য।

(৯) পৃথী—পৃথ্বী, এথানে ঈ-কারের সুপ্রয়োগ বলিতে হইবে।

(১০) ব্যাম—ব্যামোহ। (১১) আমী—আমি।

এতেক সুনিঞা[১২] ব্রহ্মা বোলিছে[১৩] বচন।
ব্যাকুল না হইয়[১৪] তুমি ধর্য্য[১৫] কর মন॥
পৃথী সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেলা শীব[১৬] স্তানে।
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে॥
তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন॥
তুমি মাতা তুমি পীতা[১৮] তুমী[১৯] বন্ধুজন।
এ মহি[২০] মণ্ডল প্রভু তোমার স্রিজন[২১]॥
এতেক বিনয় কৈলা[২২] ব্রহ্মাবর।
হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা সঙ্কর[২৩]॥
এতেক মিনতি কর কীসের[২৪] কারণ।
বোল[২৫] দেখি সুনি আমি তাহার বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা বলিলেন হাসি ত্রিলোচনে।
পৃথী ভার সহিতে নারে পাপের কারণে॥

(১২) সুনিঞা—শুনিয়া। অধিকাংশ "শ" স্থানে "স" ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১৩) বোলিছে—বলিছে। রাঢ়ীয় উচ্চারণে ওকার দেওয়া হইয়াছে।

(১৪) হইয়—হইও। এ পুথিতে কোথাও অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ার "ও"-কারের ব্যবহার নাই। সর্ব্বত্র "য়" দেখা যায়। আধুনিক সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় "য়"কার ব্যবহার করেন।

(১৫) ধর্য্য—ধৈর্য্য।

(১৬) শীব—শিব।

(১৭) স্তানে—স্থানে। ইহা স্পষ্টতঃ লিপিকর প্রমাদ, কারণ ৪র্থ চরণে "স্থাবর" শব্দে "স্থ"কারের বর্ত্তমান আকার স্পষ্ট লিখিত আছে।

(১৮) পীতা—পিতা। (১৯) তুমী—তুমি। (২০) মহি—মহী। (২১) স্রিজন—সৃজন। (২২) কৈলা—করিলা। (২৩) সঙ্কর—শঙ্কর।

(২৪) কীসের—কিসের। রাঢ়ে "কি" অর্থে "কিসের" শব্দও প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে ইহার সমধর্ম্মা (Co-relative) "ইসের" শব্দ "ইহার" অর্থে প্রচলিত আছে।

(২৫) বোল—বল। অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় ধাতুর উপান্ত অ-কারের এরূপ ওকার উচ্চারণ রাঢ়ে নাই, হিন্দী ও বঙ্গভাষীর মধ্যবর্ত্তী দেশে শুনিতে পাওয়া যায়।

পাপমতি হইল জিব করে দুরাচার।
পাপীষ্ট[26] মারিআ[27] প্রভু দুর[28] কর ভার॥
কহিতে লাগিলা হর এতেক সুনিঞা।
পাপীষ্ট মারিছি[29] দুত[30] পাঠাইঞা॥
এতেক বলিলা জদি ব্রহ্মার গোচর।
পৃথী সঙ্গে ব্রহ্মা তবে গেলা আপন ঘর॥
তবে ব্রহ্মা বিদাএ[31] করিলা পৃথীরে।
ভাবিতে ভাবিতে পৃথী আইলা য়াপন[32] ঘরে॥
ব্রহ্মাকে বিদাএ দিয়া শীব রইলা[33] ধ্যানে।
কথোক্ষণ পরে সেই কথা পইল[34] মনে॥
নন্দীকে ডাকীয়া[35] সিব[36] বলিছে বচন।
দক্ষিন[37] সহরে তুমি জাহ[38] ততক্ষন॥

(২৬) পাপীষ্ট—পাপিষ্ঠ।

(২৭) মারিআ—মারিয়া। প্রাকৃত শব্দে "য়"কারের স্থলে সর্ব্বত্র "অ"কার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় "য়" গ্রহণাবধি "অ"কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। "মরিয়া" শব্দ "মরিঞা" হইলে প্রাচীন উচ্চারণ ঠিক থাকিত, কিন্তু "মারিআ" ব্যাকরণ-সঙ্গত। প্রাচীন পুথিতে এরূপ বানানের শব্দ অনেক দেখা যায়।

(২৮) দুর—দূর। (২৯) মারিছি—মারিতেছি। (৩০) দুত—দূত।

(৩১) বিদাএ—বিদায়। ইহা "মারিআ" শব্দের ন্যায় নহে। "বিদাএ" সংস্কৃত শব্দ, প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ইহার বানান পরিবর্ত্তন হইলে "বিদাএ" হয়।

(৩২) য়াপন—আপন। আপন শব্দই বাঙ্গালা, তাহার "আ" "য়া" হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ ব্যবহার প্রাচীন পুথিতে বিরল নহে।

(৩২) রইলা—রহিলা। এই শব্দটী আরও সংক্ষেপে "রলা" হয়। "তুমি রহিলে" অর্থে "তুমি রলে" বা তুমি "রল্যা" এইরূপ য-ফলান্ত পদও হয়। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে য-ফলান্ত পদই অধিক চলিত।

(৩৩) পইল—পড়িল। (৩৪) ডাকীয়া—ডাকিয়া। (৩৬) সিব—শিব।

(৩৭) দক্ষিন—দক্ষিণ। (৩৮) জাহ—যাহ। ইহাও প্রাকৃত ব্যাকরণের পরিবর্ত্তন।

সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবিতে।
অধিষ্ঠান হয়[৩৯] জাইয়া[৪০] তাহার দেহেতে ॥
বিপরিত[৪১] পাপ হইল পৃথীবি[৪২] উপরে।
দুত পাঠাইঞা জেন[৪৩] পাপি লোক মারে ॥
এতেক শুনিঞা নন্দী গেলা সিগ্রগতি[৪৪]।
উপনিত[৪৫] হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি ॥
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেক দিন হইল বাঙ্গালার[৪৬] চৌত[৪৭] না দেএ[৪৮] মোরে ॥
দুত পাঠাইয়া দেয়[৪৯] বাদসার[৫০] স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কীসের কারণে ॥
একখানি পত্র লিখ বাদসা প্রতি।
দুত জেন তাহা লইয়া জাএ সিগ্রগতি ॥

(৩৯) হয়—হও। এই বর্ত্তমান অনুজ্ঞাবোধক "হও" "খাও" "যাও" প্রভৃতি পদ হইতে অনুজ্ঞার বিভক্তির আকার যে "ও", "য়" নহে তাহা বুঝা যায়। হইও, করিও, বলিও প্রভৃতি স্থলে "হইয়ো", "বলিয়ো", "করিয়ো" (ইহার বলিহ, করিহ প্রভৃতি রূপও আছে) "য়ো" বা "য়" কে বিভক্তি স্থলে লইলে "হইও" প্রভৃতি "ইও"কারান্ত পদে ই+ও হইয়া সন্ধির" যে আশঙ্কা থাকে তাহা নিবারিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় ওরূপ বিভক্তিজাত নিকটবর্ত্তী দুই স্বরের সন্ধি দেখা যায় না, ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে হয় বটে। অতএব "বলিয়ো" "করিয়ো" ইত্যাদি আধুনিক ভাবে বলিও করিও প্রভৃতি শব্দের বানান পরিবর্ত্তনের আবশ্যক দেখা যায় না।

(৪০) জাইআ—যাইয়া। "ইও" বিভক্তির যুক্তি অনুসারে এই "ইআ" বিভক্তিও না বদ্‌লাইলে চলিত, কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে এই দল চলিয়া গিয়াছে এখন কি করা যাইবে। তবে যদি কেহ বলেন, তবে 'ইআ' বদ্‌লাইয়া যখন "ইয়া" লইলে তখন "ইও" বদ্‌লাইয়া "ইয়ো" লাও বেদরূপটা একরূপই হউক। এই যুক্তি মানিলেও চলে কিন্তু বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় শুদ্ধ "ও" বিভক্তি স্থানে মিশ্র"য়ো" গ্রহণ করা সুবিধাজনক হইবে না। অর্থান্তর ঘটিয়া যাইবে। হও—"হয়ো" নহে ; 'হয়ো' অর্থ হইও।

(৪১) বিপরিত—বিপরীত। (৪২) পৃথীবি—পৃথিবী। (৪৩) জেন—যেন।

(৪৪) সিগ্র—শীঘ্র। (৪৫) উপনিত—উপনীত।

(৪৬) বাঙ্গালার—'বাঙ্গালা' দেশের নাম লিখিত প্রাচীন প্রয়োগ এইরূপ অতএব 'বাঙ্গলা দেশ" এরূপ লেখা ভুল। (৪৭) চৌত—চৌথ। (৪৮) দেএ—দেয়।

(৪৯) দেয়—দেহ, দাও। (৫০) বাদসা—বাদশাহ।

রঘুরাজা পত্র লিখে আখর[৫১] পাচ[৫২] সাতে।
পত্র লইঞা দুত তবে বাধিলেন[৫৩] মাথে ॥
রজনি[৫৪] প্রভাতে দুত জাএ সিগ্রগতি।
পত্র আসি[৫৫] দিলেন জেখানে দিল্লিপতি ॥
উজিরকে য়াজ্ঞা[৫৬] তবে দিলা দিল্লিশ্বরে[৫৭] ॥
সিগ্রগতি পত্র পড়ি শুনায়[৫৮] আমারে ॥
উজির পড়েন পত্র বাদসা স্থনেন।
সাহুরাজা লিখে বাঙ্গালার চৌথের কারণ ॥
বাদসা তবে আজ্ঞা দিলা উজিরেরে।
পত্র লিখহ তুমি সাহু রাজারে ॥
চাকর হইয়া মারিলে স্থবারে।
জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥
লোক-লস্কর তবে নাই আমার স্থানে।
হেন কোনজন নাই তরে গিয়া আনে ॥
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম স্থখে।
দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে ॥
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে।
চৌথের কারণে লোক পাঠায়[৫৯] তথাতে ॥
এতেক বচন পত্রে লিখীলা[৬০] উজির।
পত্র পাইঞা দুত তবে নোঞাইল সির[৬১] ॥
দুত তবে বিদাএ হইলা তরিতে।
সিগ্রগতি য়াসি[৬২] পহুছিলা সেতারাতে ॥
সভা করিঞা রাজা বইসা[৬৩] আছে স্থানে[৬৪]।
হেনকালে পত্র দুত আনে সেইখানে ॥
পত্র আসি দিলা দুত রাজার গোচর।
ডাড়াইলা এক ভিতে করি জোড়কর ॥

(৫১) আখর—অক্ষর। (৫২) পাচ—পাঁচ। (৫৩) বাধিলেন—বাঁধিলেন।
(৫৪) রজনি—রজনী। (৫৫) আসি—আনি (?)। (৫৬) য়াজ্ঞা—আজ্ঞা।
(৫৭) দিল্লিশ্বরে—দিল্লীশ্বরে। (৫৮) শুনায়—শুনাও। (৫৯) পাঠায়—পাঠাও।
(৬০) লিখীলা—লিখিলা। (৬১) সির—শির।
(৬২) য়াসি—আসি। (৬৩) বইসা—বসিয়া।

আজ্ঞা দিলা দেওয়ানকে পত্র পড়িবারে।
পত্র পড়িয়া দেওয়ান স্থনান রাজারে॥
জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।
দুই বৎসর হইল খাজানা না দেএ তারে॥
আজ্ঞা দিলা বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।
চোথাই নেএন[৬৫] জেন জবর করিঞা॥
এতেক স্থনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোনজনাকে পাঠাব মূলুক বাঙ্গালাতে॥
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ[৬৬]।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই॥
তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।
তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্করণ[৬৭]॥
রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।
তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে॥

রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সন্য[৬৮] সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নীসান[৬৯] চলে সত সত[৭০]
সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন॥
সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা তবে
এক রাত্রি রইলা সেইখানে।
রাগরঙ্গ হইল জত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পর দিনে॥
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ জত
নাগপুর আসি উপনিত[৭১]।

(৬৪) স্থানে—দেওয়ানে, দেওয়ানখানায়, দরবারে।

(৬৫) নেএন—লয়েন। (৬৬) বসিআ—বসিয়া। (৬৭) ভাস্করণ—ভাস্কর পণ্ডিত।

(৬৮) সন্য—সৈন্য। (৬৯) নীসান—নিশান। (৭০) সত সত—শত শত।

(৭১) উপনিত—উপনীত।

সেখান ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা তরিত[৭২] ॥
ডাক দিয়া দুতকে ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোনখানে ।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি দুত চলে সিগ্রগতি
নবাব যাছে জেইখানে ॥
দুত সম্বাদ লইয়া সিগ্র চলিল ধাইয়া
আসিয়া কহিল তার স্থানে ।
বর্দ্ধমান সহরে রাণির দিঘির পরে
নবাব আছে সেইখানে ॥
দুত মুখে সুনি কথা ভাস্কর চলিল তথা
লস্কর লইয়া নিসাতে[৭৩] ।
লস্কর নিসন্দে[৭৪] জাএ কেহু[৭৫] নাহি জানে তাএ
আইলা বৈসাখ[৭৬] উনিশাতে ॥
বৈসাখের উনিশা জাএ বরগি আইলা তাএ
মহা য়ানন্দিত[৭৭] হুইয়া মনে ।
বিরভুই বামে থুইয়া গোআলা ভুইর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বর্দ্ধমানে ॥
তবে বরগীর লস্করে চতুদ্দিগে[৭৮] আসি ঘিরে
হরকারা[৭৯] কেহ নাহি জানে ।
দুই প্রহর রাইতে[৮০] হরকারা আইলা তাথে
আসী[৮১] কৈল রাজারাম স্থানে ॥
রজনি[৮২] প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল
আসিয়া কহিল নবাবেরে ।
ইহা য়ামি[৮৩] না জানিল আচম্বিতে সন্য আইল
আসিয়া ঘেরিল লস্করে ॥

(৭২) তরিত—ত্বরিত। (৭৩) নিসাতে—নিশাতে।
(৭৪) নিসন্দে—নিঃশব্দে। (৭৫) কেহু—কেহ। (৭৬) বৈসাখ—বৈশাখ।
(৭৭) য়ানন্দিত—আনন্দিত। (৭৮) চতুদিগে—চতুর্দ্দিকে।
(৭৯) হরকারা—প্রহরী অর্থে ব্যবহৃত। (৮০) রাইতে—রাত্রিতে।
(৮১) আসী—আসিয়া। (৮২) রজনি—রজনী। (৮৩) য়ামি—আমি।

রাজারামে এত কএ নবাব স্নুনিয়া রএ
তদপরে[৮৪] দিলেন উত্তর ।
হরকারা পাঠাইয়া হকিকত[৮৫] আন জায়া[৮৬]
কোথা হইতে য়াইল লস্কর ॥
এতেক স্নুনিল জবে হরকারা পাঠাইল তবে
ফৌজের নির্ণয় জানিবারে ।
সাজিঞা হরকারা লস্করে ফিরে তারা
আসিয়া কহিল নবাবেরে ॥
চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিস হাজার ফৌজ লইঞা ।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহুরাজার হুকুম পাইঞা ॥
এতেক কথা স্নুনিয়া জমাদার আনে ডাকদিয়া
কহিতে লাগিলা নবাব ।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইলা চৌথ নিতে
ইহা কি বোলহ জবাব ॥
বাদশাই খাজানা জাইত শেখানে চৌথাই পাইত
স্নুজা খাঁ আছিল জখন ।
মুস্তফা খাঁ এত কএ জাহা তোমার চিত্তে লএ
তাহা তুমি করহ এখন ॥
উকীলকে কহিল সন্য সাইজা[৮৭] কেন আইল
এই কথা বল জাইয়া তারে ।
উকীল কহেন কথা ভাস্কর স্নুনেন তথা
তবেত কহিল তার পরে ॥
সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে
তেকারণে আইলাম আমি ।
জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মোরে
সিগ্রগতি চলিজাহ তুমি ॥

(৮৪) তদপরে—তৎপরে । (৮৫) হকিকত—মূলতথ্য
(৮৬) জায়া—যাইয়া । (৮৭) সাইজা—সাজিয়া ।

এতেক স্থনিয়া জবে উকীল কহিল তবে
অন্যাএ কথা কেনে বোল।
কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী আসে চৌথ নিতে
এইত অন্যাএ[৮৮] বড় হইল॥
ভাস্কর বুলিল[৮৯] তারে কেবা য়ন্যাএ করে
মনেতে কৈলে ভাবনা।
কাহার হুকুম পাইয়া মুলুক নিলা মারিয়া
বাদসাই খাজানা ভেজ না॥
স্থনিয়া উত্তর দিলা চৌথ নিতে না জানিলা
উকীল পাঠাইতা তার কাছে।
উকীল জাইয়া পরে কহিতে নবাব তরে[৯০]
চৌথাই দিতেন তিনী[৯১] পাছে॥
আপন কটক লইয়া পুন জায় ফিরিয়া
কহ তবে বাদসার স্থানে।
সনদ জদি দেএ খাজানা তবে জাএ
চৌথাই পাবে সেইখানে॥
ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হএ
চৌথ নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে রায্য[৯২] নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রন॥[৯৩]
এতেক বচন স্থনি উকীল কহেন বানি[৯৪]
ভত্র তুমি কিসে দেখায়[৯৫] তারে।
তোমার জতেক সেনা চতুদিগে দিল থানা
তারা সব কী[৯৬] করিতে পারে॥
তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহস্র[৯৭] জনা
তব[৯৮] তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

(৮৮) য়ন্যাএ—অন্যায়। (৮৯) বুলিল—বলিল।
(৯০) নবাব তরে—নবাবের পক্ষ হইয়া। (৯১) তিনী—তিনি। (৯২) রায্য—রাজ্য।
(৯৩) রন—রণ। (৯৪) বানি—বাণী। (৯৫) দেখায়—দেখাহ—দেখাও।
(৯৬) কী—কি। (৯৭) সহস্র—সহস্র। (৯৮) তব—তবু।

চৌখুটা মুলুকে সবাই জানএ তাকে
নবাবের সমান কে আছে সিপাই ॥
উকীল বুলিলা জবে ভাস্কর জানিলা তবে
কহিতে লাগিলা তারপরে।
চৌথাই না দিবে জবে যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল জাইয়া তারে ॥
উকীল আসিঞা পরে কহিল নবাবে তবে
রন করিতে সেহ চাহে।
এতেক স্থনিঞা জবে নবাব জানিল তবে
ডাক দিয়া জমাদারে কহে ॥
জত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে।
জতেক সরদার ছিল, তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে।[৯৯]
আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে
দেসে[১০০] জেন আইস্তে[১০১] নাই পরে।
বরগি সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে ॥
স্থনিয়া এতেক বানি সন্তুষ্ট হইলা তিনি
কহিতে লাগিলা ভাল ভাল।
পানবাটা কাছে ছিল পান তুইলা সভারে দিল
বিদাএ হইয়া সভে আইল ॥
এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দেএ জমাদারে
কহিতে লাগিলা তা সভারে।
তোমরা কত জনা চতুর্দ্দিগে দেয়[১০২] থানা
কতজনা জায়[১০৩] লুটিবারে ॥

(৯৯) সিপাএরে—সিপাহীকে। (১০০) দেসে—দেশে।
(১০১) আইস্তে—আসিতে। (১০২) দেয়—দেহ, দাও।
(১০৩) জায়—যাহ, যাও।

সরদারে কহে এত　　সাজে জমাদার এত
চতুর্দিগে জাএ লুটিবার।
সাজিল জত জন　　শুন তার বিবরণ
একে একে নাম বলি তার॥

ধাম্‌ধরমা জাএ আর হিরামন কাসি।*
গঙ্গাজি আমড়া জাএ আর সিমন্ত জোসি॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহড়া।
সম্ভূজি জাএ আর কেসজি আমোড়া॥
কেসরি সিংহ মহন শিংহ এ ছুই চামার।
জার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হার[১]॥
এই দশজনা জাএ গ্রাম লুটিতে।
আর চৌদ্দজনা থাকে নবাবের চাইর ভিতে।
বালারাও সেশরাও আরসিস পণ্ডিত।
সেমন্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত॥
মোহন রাএ পিত রাএ আর সিসো পণ্ডিত।
জার সঙ্গে আছে বরগি মহা বিপরীত॥
শিবাজি সামাজি আর ফিরঙ্গ রাএ।
লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি দ্রিত[২] ধাএ॥
* * * সুনতান খাঁ আর ভাস্কর।
এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর॥
একদিন দুইদিন করি সাত দিন হইল।
চতুর্দিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥

* ইতিপূর্ব্বে বানানব্যত্যয়ের এক শত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, বানান-বিভ্রাট কিরূপ বিপুল। অতঃপর আর তাহার উদাহরণ দিবার আবশ্যক মনে করি না। বিভ্রাটগুলি পাঠকের দৃষ্টিতে আপনিই পড়িবে, তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে উল্লেখ করিব।

(১) পাঁচহার—পাঁচ শ্রেণী, পাঁচ দল (Five Companies of troops) অথবা পাচ হাজার শব্দের "জ"টি পড়িয়া গিয়াছে! (২) দ্রিত—দ্রুত।

মুদি বানিঞা জত ধারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারেছমুতে[1] পাএ জারে ॥
বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুর্দ্দিকে বরগির তরে রসদ না মিলএ ॥
চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি ॥
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাএ।
খুদ্রে কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ ॥
গাজা ভাংগ তামাকু না পাএ কিনিতে।
আনাজ নাহি পাওয়া যাএ লাগিল ভাবিতে ॥
কলার আইঠা[2] জত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া[3] ॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল ॥
বিসম বিপত্য বড় বিপরিত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাবসাহেব খাইল ॥
এই মতে লস্কর আছিল চৌদ্দ রোজ।
তবে নবাব কুচ কৈলা লইয়া সব ফৌজ ॥
ঘোড়ার উপরে কত নিশান চলিল।
তবে ডঙ্কা নাগারা কত বাজিতে লাগিল ॥
ঝাকুড় ঝাকুড় কত সাদিয়ানা বাজাএ।
সাহিসরা তবে নবাবের আগে জাএ ॥
চাইদিগে[4] লস্কর চলে নাই লেখাজোখা।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে বরগী দিল দেখা ॥
চাইরদিগে বরগী আইল কত আর।
তা সভার হাতে দেখি লাহাঙ্গা তলোয়ার ॥

(১) ছমুতে—সম্মুখে, সমুখে। (২) আইঠা—এঁঠে, কদলী বৃক্ষের গোড়ার অংশ।
(৩) সিজাইয়া—সিদ্ধ করিয়া। (৪) চাইদিগে—চাইরদিকে, চারিদিকে।

তখন নবাবের লস্করে পইল হড়বড়।
হেন বেলা তেরহইনাতে[1] ধরিলা:ডেহড়[2] ॥
হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাএ একিবারে।
হারা হারা[3] কইরা আইসে কাছাইতে নারে ॥
তবে মুস্তাফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া[4] লইয়া।
বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহড় মারিয়া ॥
তবে সামনে হইতে বরগি পলাইল।
আর কত বরগি আইলা পিছাড়ি ঘেরিল ॥
মির হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল।
বেকাবুতে পইড়া সেহ মিসাইল ॥
পিছাড়ি লুটিল বরগি য়াসি আর কত।
পোড়াইল ডেরাডাণ্ডা তাম্বু যত ॥
খাজানার গাড়ি জত সাতে ছিল।
চাইর দিগে বরগি আইসা লুটিতে লাগিল ॥
হাতি ঘোড়া কত লুইটা লইয়া জাএ।
বড় বড় সিপাই জত অমনি পলাএ ॥
দউড়া দউড়ি[5] আইলা তবে নিকুলসরাএ।
মোসাহেব খাঁ তবে পড়িল ঘেরাএ ॥
ডেড় হাত্বির সাইর[6] হইল তার সাএ।
পচিশ ঘোড়া সুর্দ্দা[7] খেত আইল তাথে ॥
মোসাহেব খাঁ জদি পইল নিকুনেতে।
যল্‌দি নবাব সাহেব যাইল কাঁটয়াতে ॥
এথাতে হাজি সাহেব রসদ লইঞা।
পাঠাইঞা দিল কত নৈকায় করিয়া ॥

(১) তেরইনাতে—(?)। (২) ডেহড়—দ্যাওড়, অবিশ্রান্ত গতি।
(৩) হারা হারা—'হারারারা' করিয়া আসিয়া পড়িল, কোন বাধা মানিল না।
(৪) চাইর হার ঘোর—চারি দল অশ্বারোহী সৈন্য (Four Companies of Horse)
(৫) দউড়াদউড়ি—দৌড়াদৌড়ি।
(৬) ডেড় হাত্বির সাইর—কোনরূপ ব্যূহের অর্থাৎ সৈন্য যোজনার বিবরণ হইবে বোধ হয়।
(৭) সুর্দ্দা—শুদ্ধ।

তবে রসদ আসিয়া কাটঞাতে পহচিল।
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাচিল॥
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটঞাতে।
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে॥
ছিছিছি হাএ হাএ গেল পলাইয়া।
এতদিন ব্রথা[১] আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়া॥
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা[২] পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা[৩] মাউছা[৪] পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
সঙ্খ বণিক পলাএ করা লইয়া যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধনি।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ য়মনি॥
গোশাঞি মোহান্ত জত চোপালাএ[৫] চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জয় বাহুকে[৬] করিয়া॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা।
বিছন[৭] বল্‌দের পিঠে লাঙ্গল লইয়া॥

(১) ব্রথা—বৃথা। (২) সোনার বাইনা—সোণার বেণে।
(৩) জাউলা—জেলিয়া, জেলে। (৪) মাউছা—মেছো, মৎস্যব্যবসায়ী।
(৫) চোপালাএ—চৌপায়ায়, ডুলিতে। (৬) বাহুকে—বাঁকে, ভারে।
(৭) বিছন—বীজধান অথবা বিছানা (?)

সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল॥
গর্ভবতি নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম স্থইনা সব পলাইল॥
দস বিস লোক য়াইসা পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥
কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়া।
কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিয়া॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি।
চাঞি ধানুক[1] পালাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল॥
চাইর দিগে লোক পলাঞ ঠাঞি ঠাঞি।
ছর্ত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥

---

(১) চাঞি-ধানুক—সাঁওতাল জাতীয় পশুপালক অসভ্যজাতি।

তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড়২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব ॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া ॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া ॥
রূপি দেহ২ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পখইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ ॥
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না আইলে তারে প্রাণে মারে ॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে ॥
ত্রেতা জুগে রাজা ভগীরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা ॥
পৃথিবীতে নাম তার হইলা ভাগিরথী।
তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি ॥
তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিলা পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম স্থন মন দিয়া ॥
চন্দ্রকোনা মেদিনিপুর আর দিগনপুর।
খিরপাই পোড়ায় আর বর্দ্ধমান সহর ॥
নিমগাছি সেড়গা আর সিমইলা।
চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনইলা ॥
এই মতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চাইর ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে ॥
সের খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল।
তাহার কারণে বরগী লুটিতে নারিল ॥
সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর।
কাথারা সরাই ডামদৈ জতুপুর ॥

ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপুর চান্দড়া।
কুড়বুন পালাসি য়ার বউচি[১] বেড়ড়া॥
সমুর্দ্ধরগড়[২] জাম্ন গর[৩] আর নদিয়া।
মাহাতাপুর সুনণ্টপুর[৪] থইল পোড়াএ গিয়া॥
পরাণপুর ভাটরা পোড়াএ আর মান্দড়া।
সরভাঙ্গা খিতপুর আর গ্রাম চান্দড়া॥
সাতসইকা জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞা।
কুমিরা বউলতলি নিমদা পোড়াএ গিঞা॥
কড়ই বৈথন পোড়াএ আর চাড়ইল।
সিঙ্গি বাস্কা ঘোড়ানাস মন্তইল॥
গোটপাড়া চাঁদপাড়া আর য়াগদিয়া।
রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া॥
আতাইহাট পাতাইহাট আর ভাঞ্জিহাট।
বেড়া-ভাওসিংহ পোড়াএ আর বিকীহাট॥
এইরূপে ইন্দ্রাইল পরগণা বরগি লুটি।
কাগাএ মোগাএ লুটে ওলন্দেজের কুটি॥
এইরূপে কাগা মোগা পোড়াইঞা।
রাতারাতি পহুচিলা জাউমন্দকান্দি[৫] গিয়া॥
তবে বিরভুই[৬] পরগণা বরগি দিল পোড়াইয়া
আমডহরা মহসেরপুর থানা কৈল গিঞা॥
গোয়ালাভুঞি সেনভুঞি সব পোড়াইলা।
চতুর্দিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা॥
তবে বোনবিষ্ণুপুর[৭] গোপাল রক্ষা করে।
য়সাধ্য[৮] বরগির তবে কি করিতে পারে॥
সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া।
নৈহাটী উর্দ্ধানপুর কাটাঞ ডাইনে থুইয়া॥
বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল।
মাঙ্গনপাড়া সাটই কামনগর আইল॥

(১) বৈচি। (২) সমুদ্রগড়। (৩) জাননগর। (৪) সুনন্দপুর
(৫) জেমুয়া কান্দী। (৬) বীরভূমি। (৮) য়সাধ্য—অসাধ্য।

মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমানিক আইলা বরগী রাঙ্গমাইটা[১] দিয়া ॥
গোয়ালজান বুধইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া।
সিগ্রগতি আসিয়া পহচিল দাহাপাড়া ॥
হাজি ছোট নবাব উপারে[২] ছিল।
বরগির নাম সুইনা কীল্লাএ সাঁধাইল ॥
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
শীগ্রগতি আইসা জগৎ সেটের বাড়ী লুটে ॥
আড়কাট[৩] টাকা যত ঘরে ছিল।
ঘোড়ার খুরচি[৪] ভইরা সব টাকা নিল ॥
তবে সও[৫] দুই তিন টাকা ছড়াইয়া।
শীগ্রগতি গেলা বরগা গঙ্গা পার হইয়া ॥
তবে ফকীর-ফকীরা[৬] গিরস্ত জত ছিল।
সেই সব টাকা তারা লুটিতে লাগিল ॥
তবে কাটঞাতে নবাব সাহেব সুনিল।
জগত সেটের বাড়ী বরগি লুইটা গেল ॥
এতেক কথা জদি হরকরা কহিল।
কাটঞা হইতে নবাব শীগ্র চলিল ॥
রাতারাতী তবে নবাব আইলা মোনকরা।
ভোর হইতে হইতে তবে পহছিলা ডেরা ॥
তবে হাজি সাহেবকে নবাব অনেক বুলিল।
এতেক লস্কর রইতে বাড়ী লুইটা গেল ॥
নবাব সাহেব যদি আইলা কীল্লাতে।
তবে সব বরগি জড় হইল কাটঞাতে ॥
আসাড় মাসের দেওয়া[৭] ঘন[৮] বরিষণ।
অজএ ভাসিয়া গঙ্গা ভরিল তখন ॥
গঙ্গা ভরিল যদি ইপার উপার।
তবে বরগী লুটিবারে নাহি পাএ আর ॥

(১) রাঙ্গামাটী। (২) উপারে—ওপারে, অপর পারে। (৩) আড়কাট—আড়াই কোটী
(৪) খুরচি—ঘোড়ার ঘাস খাইবার ছোট থলি, তোমড়া। (৫) সও—শত।
(৬) ফকীর-ফকীরা—ফকীর-ফক্‌রাণ, ফকীরাদি। (৭) দেবতা, মেঘ। (৮) ঘন—অবিরল।

কাটঞা ভাওসিংহ-বেড়া ডাইহাট নিয়া।
চাইরদিগে বরগি ছায়নি কৈল গিয়া॥
গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তারা সবে আসি ভাস্ককে মিলিল॥
গ্রামে গ্রামে যত তাগিদার গেল।
তারা সব জাইয়া খাজনা সাদিতে লাগিল॥
এথা মির হবিব লইয়া কিছু স্থন বিবরণ।
ফরাসবন্দির[1] পর্ত্তন করিলা তখন॥
বড় বড় নৌকা যেখানে যত ছিল।
বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল॥
ইপারে উপারে লাহাস[2] দিল তানাইয়া[3]
নৌকা সব তার মধ্যে রাখিল বান্ধিয়া॥
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস[4]।
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন ফরাস॥
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইছাএ পাইছাএ মাটী ফেলিতে লাগিল॥
মাটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর॥
ডাঞিহাটের ঘাটে যদি পুল বাঁধা গেল।
কত সত বরগী তারা লুটিতে চলিল॥
এথা ভাস্কর লইয়া কিছু স্থন বিবরণ।
জেরুপে[5] ডাঞিহাটে কৈলা পূজা আরম্ভন॥
তবে গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগতজননি মায়ের পূজা করিতে চাই॥
এই কথা ভাস্কর কহিল তা সভারে।
শ্রদ্ধা পাইয়া তারা সব উর্জোগ[6] করে॥

(১) ফরাসবন্দি—পুলবন্ধি। (২) লাহাস—(?)। (৩) তানাইয়া—টানাইয়া, বাঁধিয়া।
(৪) বাস—বাঁশ। (৫) জেরুপে—যেরূপে। (৬) উর্জোগ—উদ্যোগ।

ঘটকর্পুর[১] আনে কেহ করিয়া সম্মান।
আসিঞা প্রতিমা তারা করেন নির্ম্মান ॥
এইরূপে কুমার প্রতিমা বানাইয়া।
ভাস্করের ঠাই তারা গেল বিদায় হইয়া ॥
তারপর উপাদএ সামগ্রী আইল জত।
ভার বাহাঙ্গিতে বোঝাএ কত শত ॥
ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে ॥
এই মতে করে ভাস্কর পূজা আরম্ভন।
এথা মির হবিব বরগী লইয়া করিল গমন ॥
তবে বরগী ফরাসবন্দিতে পার হইয়া।
রাতারাতি ফুটীসাঁকো উঠিলেন গিয়া ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হুড়বড়ি হইল।
ফুটিসাঁকো বরগি আইল নবাব শুনিল ॥
তবে নবাব সাহেব নকিব পাঠাএ।
দ্বিতীয়প্রহর রাইতে নকিব শীঘ্র ধাএ ॥
নকিব আসিঞা তবে বোলে বার বার।
হুকুম নবাবের সোয়ারি করহ তৈয়ার ॥
এতেক কহিল জদি নকিব আসিয়া।
তবে সব ঘোড়ায় জিন দিল চড়াইয়া ॥
একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে ॥
মুস্তাফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার ॥
রহম খাঁ করম খাঁ দুইজনাতে জাএ।
দশ হাজার ঘোড়া জার সঙ্গে ধাএ ॥
আতাউল্লা মির জাফর দুইজনা সাজিল।
পোনের হাজার ঘোড়া সঙ্গে চলিল ॥
উমর খাঁ আসালত দুই জনাতে গেল।
পাঁচ হাজার ঘোড়া সঙ্গে কইরা নিল ॥

(১) ঘটকর্পুর—ঘটকর্পর, প্রতিমানির্ম্মাতা, কুম্ভকার।

ঠাকুরসিংহ জাএ আর বক্সি বহনিয়া[১]।
চল্লিশ হাজার বহনিয়া সঙ্গেত করিয়া ॥
ফতেহাজি ছেদনহাজি দুই জনাতে গেল।
পেএতিশ[২] হাজার বহনিয়া সঙ্গে চলিল ॥
সাইট হাজার ঘোড়া ডেড়লাক বহনিয়া।
তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া ॥
যেই মাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল ॥
তবে বরগি পিঠ দিয়া শীঘ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ ॥
পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল।
নবাব সাহেবের নাম সুইনা অমনি পলাইল ॥
সিগ্রগতি আসি বরগি পুলে পার হইল।
পার হইঞা পুল তবে কাটঞাত দিল ॥
এথা নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে।
দেখে বরগির ছাউনি কাটিঞাত[৩] উপরে ॥
রহনপুরে নবাব সাহেব মোরচা দিল।
চতুদ্দিগে তোপ খা রুপিয়া রাখিল ॥
পূরনিয়া[৩] পাটনাএ লেখিলেন খত।
চলিলা দুইজনা শুইনা হকিকত ॥
হেথা জয়ন্দি[৪] আহম্মদ খাঁ আইলা পাটনা হইতে।
বার হাজার ঘোড়া ফৌজ লইয়া সাথে ॥
নবাব বাহাদুর আইলা পুরনিয়া হতে।
পাচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়া সাথে ॥
তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে।
পূজা না হৈতে আগে মার ভাস্করকে ॥
নবাব বোলে আগে দসরা জাউগ।
চাইর দিকে জল কাদা সকলি সুখাউগ ॥

(১) বহনিয়া—ভারবাহী। (২) পেএতিশ—পঞ্চত্রিংশ।
(৩) কাটিঞাত—কাটিয়া, ভাঙ্গিয়া। (৩) পূর্ণিয়া। (৪) জয়ন্দি—জৈমুদ্দীন্।

এত যদি নবাব বুলিলা তার তরে।
জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ বোলে নবাবেরে ॥
জল কাদা শুকাইলে বরগির হবে বল।
চতুর্দিগে লুটিবে পোড়াবে সকল ॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকায় করিয়া।
রাতারাতি যেন বরগী মারে গিয়া ॥
জয়ন্দী আহম্মদ নবাব এই মনস্থবা করে।
মির হবিব লইঞা কিছু শুন তার পরে ॥
বড় বড় কামান আইনা থুইলা থরে ঘরে।
হুগলি হইতে স্থলুফ[১] আনে তার পরে ॥
তবে গোলন্দাজে গোল দাগিতে লাগিল।
মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল ॥
জেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পৈল।
তখন নবাব সাহেবের অমনি পিছাইল ॥
গোলা দাগিতে কামান গেল ফুইটা।
স্থলুফ ডুবিল তলা তার ফাইটা ॥
দস বিস লোক তারা নিকটে ছিল।
কামান ফাটীয়া দুই চাইর জনা মইল ॥
স্থলুফ কামান যদি দুই তবে গেল।
শুনিয়া মির হবিব তবে ভাবিতে লাগিল ॥
ফত্তে নাই নাই বলে বারে বারে।
এতেক উর্জোগ করিলাম নারিলাম জিনিবারে ॥
সূর্য্য অস্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন।
এথা নবাব লইঞা কিছু স্থন বিবরন ॥
সম্বাদ লইয়া হরকারা আইলা হাইটা[২]।
কহিল নবাবে কামান গেল ফাইটা ॥

(১) স্থলুফ-স্থলুক—একপ্রকার বাণিজ্য-দ্রব্যবাহী দূরগামী বৃহৎ নৌকা। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও এই স্থলুক নৌকা কলিকাতা, হুগলী, হিজলী, প্রভৃতি বন্দর হইতে মান্দ্রাজ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত

(২) হাইটা—হাটিয়া

এতেক শুনিয়া নবাবে হৈল বল।
হুকুম করিলা ফৌজে আউগাউক[1] সকল ॥
জত লস্কর তারা পিছে হইটা ছিল।
আপন আপন মোরচাএ সভাই আইল ॥
তবে বল মহাতাব[2] সব জ্বালিয়াত দিল।
বরকন্দাজের পরা[3] মোরচাএ লাগিল ॥
হাজারে হাজারে আওয়াজ হএ একিবারে।
ডাড়াইয়া বরগি সব দেখে উপারে ॥
এই মতে নবাবের ফৌজ আছে বরাবরে।
এথা জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ আইলা উদ্ধারণ পুরে ॥
বড় বড় পাটেলি[4] সাথে আইসা ছিল।
জুড়িন্দা[5] বাধিয়া গুদারা[6] লাগাইল ॥
উর্দ্ধরনপূরে জত ফৌজ পার কৈলা।
য়জএর ধারে আইসা সব দাড়াইলা ॥
পূনরপি জুড়িন্দা আইনা লাগাইল।
দশ হাজার ফৌজ নিসন্দে পার হৈল ॥
বাইস সও লোক সুর্দ্ধা রতন হাজারি।
পাটেলির উপরে তারা সভে চড়ি ॥
যেই মাত্র পাটেলি আইল মধ্যখানে।
তলা ফাটীয়া ডুবিল সেই স্থানে ॥
পাটেলি ডুবিল ফৌজে হইল কলরব।
উপারে বরগীর ফৌজে জানিলা সব ॥
মোগল আইল আইল পইল হড়বড়ি।
তখন ঘোড়ায় চড়িয়া বরগি জাএ দউড়া দউড়ি ॥
বরগির লস্করে জদি পইল হড়বড়।
হেনকালে বহইনাতে ধরিলা ডেহড় ॥
এক এক ঘোড়ায় দুই দুই বরগি চড়িয়া।
দ্রব্য সামগ্রী কত জাএ ফেলাইয়া ॥

---

(১) আউগাউক—অগ্রসর হউক।
(২) মহাতাব—মশাল, বৃহৎ আলোক। (৩) পরা—(?) (৪) পাটেলি—নৌকাবিশেষ।
(৫) জুড়িন্দা—বাঁধিয়া, জোড়া গাঁথিয়া। (৬) গুদারা—অস্থায়ীসেতু।

সপ্তমী অষ্টমী দুই পূজা করি।
ভাস্কর পলাইয়া জাএ প্রতিমা ছাড়ি॥
মিষ্টান্ন সামগ্রী যত ছিল কাছে।
বহনিয়া লুটিতে লাগিল তার পাছে॥
ছাগ মৎস্য মহিষ জাহা যত ছিল।
বহনিয়া আসিয়া সব লুটিতে লাগিল॥
এই মতে সামগ্রী লুটে বহনিয়া।
হোতা ফৌজ লইয়া ভাস্কর গেল পলাইয়া
ভাস্কর পলাইয়া যদি গেল অনেক দুরে।
জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ স্থনিল তার পরে॥
সাদিয়ানা নহবত[১] কত বাজে থরে থরে।
ফকির ফুকুবাকে খএরাত কত করে॥
আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্রমাসে পুনরূপি আইল সাজিয়া॥
জেই মাত্রে পুণরূপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল॥
স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা॥
এতেক বচন জদি বলিল সরদার।
চতুর্দিকে লুটে কাটে বোলে মারমার॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা সত সত কৈল॥
হাজারে হাজারে পাপ কৈল দুর্ম্মতি।
লোকের বিপত্য[২] দেখি রুষিলা পার্ব্বতী॥
পাপিষ্ট মারিতে আদেশিলা পসুপতি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হত্যা কৈল পাপমতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী॥
ভৈরবি জোগিনী জত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কৈরা তারা ছমুতে[৩] ডাড়াইল॥

---

(১) সাদিয়ানা নহবত—অশ্বারোহী সৈন্যদলসঙ্গী-নহবত বাদ্য।
(২) বিপত্য—বিপত্তি, বিপদ। (৩) ছমুতে—সম্মুখে।

তবে দুর্গা কহে স্ুন যতেক ভৈর
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি ॥
এতেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন।
এখন জেরূপেতে ভাস্কর মৈল স্থন বিবরণ ॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি আইল কাটঞাতে।
স্থনিঞা নবাবের ডেরা পইল মোনকরাতে।
পাল চাই ধুম পইল সহরেতে।
মুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে ॥
মোনকরাতে নবাবের ফৌজ হইল স্থমার।
ভাস্কর লইয়া কিছু শুন তবে আর ॥
তবে আলি ভাই বলে ভাস্করের তরে।
এইরূপে কতবার আসিবা বারে বারে ॥
ফৌজকে মানা কর গ্রাম লুটিতে।
আগি জাইয়া বন্দোবস্ত করি নবাবের সাথে ॥
এতেক স্থনিয়া ভাস্কর কহিলেন তাকে।
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাবকে ॥
তবে আলি পচিশ ঘোড়া লইয়া সাথে।
নবাবের সাতে মিলিতে আইল মোনকরাতে ॥
ফুটিসাঁকো যদি আলি ভাই আইলা।
সেইখানে থাকিয়া উকিল পাঠাইলা ॥
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে।
আলিসাহেব আইসে নবাব সাহেবকে মিলিবারে ॥
তবে নবাব বোলে বোল যাইয়া তারে।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা মিলুক আমারে ॥
উকিল আসিয়া তবে কহিলেন তাকে।
হাতিয়ার থুইয়া যাইয়া মিল নবাবকে ॥
আলি ভাই য়াইলা তবে হাতিয়ার থুইয়া।
পচিশ ঘোড়া স্থদ্ধা মিলিল আসিয়া ॥
নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ।
আলি ভাই বোলে বন্দোবস্তের কারণ ॥
ভাস্করের সাথে বিবাদ কেনে কর।
দুই জনাতে মিইলা কিছু বন্দোবস্ত কর ॥

তবে নবাব সাহেব বুলিলেন তারে।
ভাস্কর আসিয়া নাকি মিলিবে আমারে॥
জে সময়ে পূর্ব্বে ঘেইরাছিল বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তার স্থানে॥
বন্দবস্ত করিতে যদি থাকিত তার মনে।
সেই সমএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে॥
মুলুক পোড়াইল লুটিল বারবার।
কাঁউয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিব য়ার॥
আলি ভাই বোলে যাহা হবার তা হৈল।
কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল॥
দুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে।
ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে॥
তবে নবাবসাহেব কহিল দুজনারে।
আলি ভাইএর সঙ্গে যাইয়া আন ভাস্করে॥
জানকীরাম মুস্তফা খাঁ দুজনে চলিল।
কাটোঞাায় যাইয়া ভাস্করকে মিলিল॥
ভাস্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল।
মুস্তফা খাঁ জানকীরাম দুই জনাএ আইল॥
নবাব সাহেব পাঠাইল দুই জনারে।
সঙ্গে কইরা লইয়া জাইয়া মিলাবে তোমারে॥
এতেক শুনিয়া তবে মির হবিব কয়।
কদাচিত ভাস্করকে জাইতে মত নএ॥
মির হবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে।
কদাচিত জাইয়া তুমি না মিল তাহারে॥
মোগলের ফের তুমি করিবা মোনস্থবা।
আমার কথা শুন জদি কদাচিত না যাবা॥
তবে মুস্তাফা খাঁ কহিতে লাগিল।
এতেক কথা তুমি কেনে কহিলা॥
আমরা দুই জনাএ তবে সঙ্গে কইরা নিব।
বন্দবস্ত কইরা পুন এইখানে আনিব॥
কিছু কিন্তু জদি মনে কর তুমি।
কোরাণ দরমান কইয়া কিরা খাইছি আমি॥

জানকীরাম কহে গঙ্গাজল সালগ্রাম লইয়া।
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিব মিলাইয়া॥
এতেক শুনিয়া ভাস্কর বোলে ভাল ভাল।
মুস্তফা খা বোলে তবে শীঘ্র কইরা চল॥
ভাস্কর বোলে সাথে ফোজ নিব কত।
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় জত॥
আলি ভাই বোলে ফৌজে নাহি কাম।
জন দশ বারো লোক সঙ্গে কইরা জান॥
মির্ত্তুকাল হইলে যেন মতিচ্ছন্ন পাএ।
আলি ভাইএর কথায় ভাস্কর ভুইলা যাএ॥
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে॥
আলি ভাই আদি করি বাইস জনা য়াইল।
পলাসি য়াসিঞা ভাস্কর ডেরায় থাকিল॥
তার পরদিনে ভাস্কর করিল গমন।
এথা নবাব লইয়া কিছু শুন বিবরণ॥
হরকারা বোলে নববাকে ভাস্কর য়াইসে।
এতেক শুনিয়া নবাব সভা কৈরা বৈসে॥
সোটাবর্দ্দার খা সর্দ্দার নবাবের আগে।
বড় বড় জমাদার বসিলা চাইর দিগে॥
দুসরঞ্জি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে॥
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য[1] গুইলা[2] গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল॥
ভাস্কর পণ্ডিত জদি মিলিল নবাবকে।
তার পরে নবাব কহেন কিছু তাকে॥
আমার মুলুক তুমি লুটিলা বারে বারে।
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলা আলি ভাইএর তরে॥
যে কালে আসিয়া তুমি ঘেরিলা বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তোমার স্থানে।

(১) বুধ্য—বুদ্ধি। (২) গুইলা—গুলাইয়া।

বন্দোবস্ত করিতে যদি থাকিত তোমার ম'
সেই সময় উকিল তুমি পাঠাইতে আমে' নে ॥
তবে এতেক শুনিয়া ভাই আলি কহি. .
এত দিন জাহা হবার তাহা হইল ॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলে তোমার সনে।
কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার সনে ॥
এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি[৩] ॥
পূর্ব্বে সভারি মন সুবা ছিল।
সেই মন সুবাএ নবাব উঠা গেল ॥
নবাব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ।
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন ॥
দুই ডণ্ড বিলম্ব হইল কহে মুস্তাফার ঠাই।
এখন তবে আমি সান[৪] পূজাএ জাই ॥
মুস্তফা খাঁ বোলে চলো সভাই মিলে জাই।
সেপহরিতে[৫] আসিব নবাবের ঠাই ॥
এতেক বুলিয়া মুস্তফা খাঁ উঠিল।
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল ॥
জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তলোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে ॥
সেইক্ষণে তবে ঘটাচট্টি হইল।
জত জনা য়াইসা ছিল সব জনা মইল ॥
তারপরে নবাব সাহেব সমাচার সুনে।
সুনি য়ানন্দিত নবাব হইল সেইক্ষণে ॥
সাদিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল।
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত দিল ॥
মোনকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল।
মনসুবাদ উড়াইয়া কবি গঙ্গারাম কইল ॥

ইতি মহারাষ্টা পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব ॥ সকাব্দা ১৬৭২,
সন ১১৫৮ সাল ॥ তারিখ ১৪ পৌস, রোজ শনিবার ॥

(৩) লঘ্যি কইরা আসি—প্রস্রাব করিয়া আসি, 'লঘ্যি' শব্দের অর্থ প্রস্রাব নহে। সভাস্থলে এই সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে। ইহা ঠিক ইংরাজী Please let me go out হিসাবের কথা।
(৪) সান—স্নান। (৫) সে পহরিতে—তৃতীয় প্রহরে।